আবর্ত

শ্রীইন্দুভূষণ দাস

গণ-দ্বীপায়ন পাবলিশার্স

প্রকাশক ঃ

শ্রীঅনিলকুমার পাল

॥ গণ-দীপায়ন ॥

১৭০এ, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৪

● ●

প্রথম সংস্করণ ঃ আশ্বিন, ১৩৫৮

● ●

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ

গ্র্যাফিস্ ষ্টুডিয়ো

● ●

দাম—দুই টাকা।

মুদ্রাকর

শ্রীব্রজদুলাল সেন

নব মুদ্রণ লিমিটেড

১৭০এ, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৪

এই কাহিনীর চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। কারো চরিত্র সম্বন্ধে কোনরকম কটাক্ষ করবার কিছুমাত্র ইচ্ছা না থাকলেও গল্পকে বাস্তবধর্মী করতে গিয়ে যদি কারো চরিত্রের সঙ্গে এ বইয়ের চরিত্রের একআধটু মিল হয়ে যায় তাহলে সেটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রুফ্ দেখার ত্রুটীর জন্য বইতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। ছাপা শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন ওগুলো আর শোধরানো সম্ভব নয়; তাই এইসব ভুলের জন্য আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চাইছি পাঠক পাঠিকাদের কাছে।

বন্ধুবর শ্রীঅনিলকুমার পালের আন্তরিক ইচ্ছা আর সহানুভূতিতেই যে বইখানা প্রকাশিত হ'তে পেরেছে একথা আমি সর্বান্তকরণে স্বীকার করছি। ইতি—

শ্রীইন্দুভূষণ দাস

৮নং মোহন বাগান লেন,
কলিকাতা।
মহালয়া, ১৩৫৮।

স্বর্গত পিতামাতার স্মৃতির উদ্দেশে

—ইন্দু

আবর্ত

---বাবাকে ওরা অমন করে বাঁধছে কেন মা ?

শিশু অজয়ের এই প্রশ্নে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শৈলবালা। ছেলেকে সে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কি যেন বলতে যায়, কিন্তু কান্নায় গলা ধরে যাওয়ায় মুখ দিয়ে কোন কথা বার হয় না তার।

মা'র কান্না দেখে কেঁদে ওঠে অজয়।

বাধাছাঁদা শেষ হ'লে ঘোষেদের বাড়ির হেমন্ত এসে বলে—"ওকে যে এখন ছেড়ে দিতে হবে বৌদি! বাপের শেষ কাজ আজ যে ওকেই করতে হবে।"

অজয়কে কোলে তুলে নেয় হেমন্ত ঘোষ।

ওরা যখন অজয়ের বাবাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে যায়, শৈলবালা তখন ছুটে এসে একেবারে আছড়ে পড়ে উঠানের উপরে। মায়ের আর্ত চীৎকারে দিশেহারা হয়ে যায় অজয়।

বিকালে ওরা শ্মশান থেকে ফিরে এলে গাঁয়ের ক'জন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক শৈলবালাকে পুকুরঘাটে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে হাতের নোয়া খুলে, শাঁখা ভেঙ্গে, মাটি দিয়ে ঘষে তার

এয়োতির চিহ্ন সিঁথির সিন্দুরের রেখা মুছে বিধবার সাজে সাজিয়ে দেয়।

*　　　　　*　　　　　*

দশ বৎসর বয়সে শৈলবালা এ বাড়িতে এসেছিল কনে বউ হ'য়ে। সে আজ ষোল বৎসর আগের কথা। এ বাড়িতে তখন কত লোকজন। তার শ্বশুব, শাশুড়ি, ননদ, পিসশাশুড়ি আর হারান নামে এক পুরাণো চাকর। তার স্বামী মনীন্দ্রর বয়স তখন আঠার। বিয়ের আগের বছরই মাত্র সে ম্যাট্রিক পাশ করে।

শৈলবালার শ্বশুর হরিশ্চন্দ্র দত্ত মশাই খুব রাশভারি লোক ছিলেন। বাড়ির সবাই তাঁকে ভয় করত। শৈলবালা কিন্তু তাঁকে মোটেই ভয় করত না। সে তাঁকে নিজের বাবার মতই দেখত। দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম করতে তিনি যখন খাটের উপরে শুয়ে পড়তেন শৈলবালা তখন এসে তাঁর পাকা চুল তুলতে বসত। বৃদ্ধ সকৌতুকস্নেহে বলতেন—পাগলি মা! আমার মাথার পাকা চুল তুললে যে কিছুই আর বাকি থাকবে না!"

শৈলবালাকে তিনি নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করতেন।

তারপর তার ননদের বিয়ে হয়ে সেও শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। শ্বশুর মশাই মারা গেলেন। তিনি মারা যাবার দুবছর পরে শাশুড়ীও মারা গেলেন। তার স্বামী মণীন্দ্রর মাথায় তখন

পড়ল সংসারের চাপ। মনীন্দ্র ভাল ফুটবল খেলত তাই তার খেলার সুযোগে সে ষ্টীমার কোম্পানিতে পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে গেল।

তখনকার দিনে পঁচিশটাকা মাইনের চাকরি পাওয়া ভাগ্যের কথা ছিল। সকালে স্নান খাওয়া সেরে মনীন্দ্র কাজে যেত ষ্টীমার ঘাটে আর ফিরে আসত প্রায় সন্ধ্যার সময়। মনীন্দ্রকে কোম্পানির এজেণ্ট ফেয়ারওয়াটার সাহেব খুব ভাল চোখে দেখতেন তাই দুই বছর যেতে না যেতেই তার মাইনে চল্লিশ টাকা হয়ে গেল।

সাহেব বদলি হয়ে যাবার আগে মনীন্দ্রকে তিনি কলকাতায় হেড অফিসে পাঠিয়ে দেন। হেড অফিসে বদলি হয়ে এসে মনীন্দ্রর মাইনে পঁচাত্তর টাকা হয়। কলকাতা এসে মনীন্দ্র শোভাবাজার অঞ্চলে দশ টাকায় একখানা ঘর ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে আসে।

শৈলবালার তখনও কোন সন্তান হয় নাই। ছোট্ট ঘরখানি পরিপাটি করে গুছিয়ে ওরা ওদের নূতন সংসার পেতে বসে কলকাতার বাসাবাড়িতে। ঐ বাড়িতেই অজয়ের জন্ম হয়। সেই সময়টা মনীন্দ্রর সে কি দুশ্চিন্তা, কোথায় হবে, কে দেখাশুনা করবে, কি করে মানুষ করে তুলবে তাদের সন্তানকে এই সব কত ভাবনা, কত ভয়। বেলগাছিয়া হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডে শৈলকে ট্যাক্সি করে এনে যেদিন ভর্ত্তি করে দিল সে দিনটা মনীন্দ্র অফিস কামাই করে

হাসপাতালের পাশে এক খাবারের দোকানে বসে রইল, কি জানি যদি কিছু বিপদ আপদ হয়। বেলা পাঁচটার সময় মনীন্দ্র ওয়ার্ডে গিয়ে দেখে যে শৈলবালা অজ্ঞানের মত পড়ে আছে আর তার খাটের পাশে আর একখানা ঘেরা দেওয়া লোহার ছোট্ট খাটে শুয়ে আছে একটি কচি শিশু।

মনীন্দ্র শৈলবালাকে ডাকে! তন্দ্রা ভেঙ্গে শৈলবালা তাকায় স্বামীর দিকে, মুখে তার হাসির রেখা। শিশুটিকে দেখিয়ে বলে "তোমার ছেলে।"

মনীন্দ্র সন্তর্পণে ছেলের নরম তুলতুলে গালে হাত দিয়ে আদর করে।

ছেলে হবার কয়েকদিন পরেই মনীন্দ্রর চাকরিতে উন্নতি হয়। অফিসে ভাল কাজ করায় তার পদোন্নতি হয়েছে আর মাইনেও বেড়ে এক'শ টাকা হয়েছে। সেদিন বাড়ি ফেরবার পথে মনীন্দ্র স্ত্রীর জন্য একখানা আকাশ রংয়ের ঢাকাই শাড়ী আর ছেলের জন্য জামা, জুতা আর দোলনা কিনে নিয়ে আসে।

বাড়িতে এসে বলে "ওগো শুনছ, ছেলের আমার খুব পয় গো, আজ আমার কাজে উন্নতি হয়েছে, মাইনেও বেড়ে এক'শ টাকা হয়েছে।"

শৈলবালা বলে "ও কথা বলতে নাই।"

খুব সচ্ছন্দে না হলেও ওদের সংসার বেশ সুখেই চলছিল। এই সময় একদিন মনীন্দ্রর এক আত্মীয় তার স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা আসে চিকিৎসার জন্য। পাড়াগাঁয়ের মানুষদের

একটা স্বভাব এই যে কলকাতায় কোন আত্মীয়স্বজন থাকলে তারা নির্বিচারে এসে তার বাড়িতে উঠে পড়ে। চক্ষুলজ্জায় "বাড়ী থেকে চলে যাও" একথা বলতে পারে না প্রায় সবাই তাই মনীন্দ্রর বাড়ীতেও যখন তার আত্মীয় এসে উঠল রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে তখন হাজার অসুবিধা হ'লেও মনীন্দ্র মুখ ফুটে তাদের বাড়ি থেকে চলে যেতে বলতে পারল না।

মনীন্দ্রর আত্মীয়ের এই স্ত্রীটির হয়েছিল যক্ষ্মা। এক ডাক্তারকে দেখাতেই তিনি বললেন "এতদিন কি করছিলেন, শীগ্‌গীর যাদবপুর দেবার ব্যবস্থা করুন, আর যদি না পারেন তাহলে বাড়িতেই ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।"

মণীন্দ্র লেখাপড়া শিখলেও যক্ষ্মারোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে তার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিলনা। প্রায় দুইমাস ঐ যক্ষ্মারোগী মণীন্দ্রর সেই স্বল্পপরিসর ঘরে থেকে শালকিয়া না কোথায় এক বাসা ঠিক করে উঠে যায়। মণীন্দ্র জানতেই পারল না যে এই দুই মাসের মধ্যেই কি ভয়ানক রোগের বীজাণু তার দেহে সংক্রামিত হয়ে গেছে।

বছর না ঘুরতেই মণীন্দ্রর শরীর ভেঙ্গে পড়ল। তার খিদে মরে গেল। খুক্ খুক্ কাশি, বুকে ব্যথা আর একটু একটু জ্বর হওয়াও আরম্ভ হ'ল। ক্রমশ অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে সে আর অফিসে যেতে পারে না।

ডাক্তার উপদেশ দিল যে মেডিকেল কলেজে চেষ্ট ডিপার্ট-মেণ্টে দেখালে ভালো হয়। চেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে পরীক্ষা করিয়ে

মণীন্দ্র জানতে পারল যে তার থাইসিস হয়েছে। চিকিৎসা চললো। প্রথমে ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকসন, পরে এ, পি, আর সেই সঙ্গে ভাল ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা। প্রভিডেন্ট ফণ্ড থেকে টাকা ধার নিয়ে মণীন্দ্র চিকিৎসা চালাতে লাগল। অবস্থা ক্রমশঃ এমন হয়ে দাঁড়াল যে অফিসের চাকরিও আর থাকে না। ছুটি যা পাওনা ছিল তার উপরও 'মেডিকেল লীভ্', 'লীভ উইদাউট পে' চলতে লাগল মণীন্দ্রর। মাইনে পায় না। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা ফুরিয়ে এসেছে, এইবার শৈলবালা তার গয়নাপত্র বিক্রি করে স্বামীর চিকিৎসা করাতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তাও গেল। অবস্থা তখন এমন দাঁড়াল যে বাড়ি ভাড়া, বাজার খরচ এসবই চলে না।

এদিকে মণীন্দ্র তখন একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। উপায়ান্তর না দেখে একদিন মণীন্দ্র স্ত্রীকে বলে "ওগো শুনছ।"

শৈল—"কি বলছ ?"

মণীন্দ্র—"চলো আমরা গ্রামে ফিরে যাই, এখানে থাকলে তো না খেয়েই মারা যেতে হবে।"

শৈল "কিন্তু গ্রামে গেলে তোমার চিকিৎসার কি হবে ?"

মণীন্দ্র তখন থাইসিস রোগটি যে কি তা হাসপাতালে যাতায়াত করে আর ডাক্তারদের কাছে শুনে খুব ভাল করে বুঝে নিয়েছে। তাই সে বলল—

"আমার যে রোগ এ একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ সারাতে পারবে না, এখানে থাকলে বাড়ি ভাড়াই

বা কি করে দেবে, আর সংসারের খরচই বা কি করে চলবে ?”

শৈলবালা বলে “তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি বাড়িতে ঠোঙ্গা তৈরি করছি, তাতে দিনে কমপক্ষে এক টাকা রোজগার হবে। ওতেই কোনরকম চালিয়ে নিতে পারব। আর শুনেছি রেডক্রেশে দরখাস্ত করলে নাকি চিকিৎসার জন্য সাহায্য করে। ভাবছি পাশের ঘরের অবনী ঠাকুরপোকে সঙ্গে করে আমি যাবো একদিন সেই অফিসে।”

কিছুদিন এইভাবে চললেও আর চলে না। ছেলেটা খেতে না পেয়ে চোখের সামনে ক্রমশঃ শুকিয়ে উঠছে দেখে শৈলবালা অবশেষে গ্রামে ফিরে যেতে রাজী হয়।

সাত বছরের কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে পাড়ার সবার কাছে বিদায় নিয়ে মোটঘাট পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে রুগ্ন স্বামী আর চার বৎরের শিশুপুত্র অজয়কে নিয়ে শৈলবালা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে বসে।

দেশের বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। গ্রামের এক সহায়-সম্পদহীনা বৃদ্ধা আর কোথাও ঠাঁই না থাকায় ওদের বাড়িতে থাকত। বুড়ী এর গাছের কলাটা, ওর বাগানের মূলাটা, কুমড়াটা সুযোগ পেলেই টান দিত। এই নিয়ে গাঁয়ের সবাই বুড়ীকে কত সময় কত গালাগালি করত।

বাড়িতে থাকলে পাহারার কাজ হবে মনে করে মনীন্দ্র

বুড়ী যখন বাড়িতে এসেছিল তখন কিছু বলে নাই। সেই থেকেই বুড়ী মনীন্দ্রর বাড়িতে ছিল। বুড়ীকে বাড়িতে থাকতে দেওয়ায় গ্রামের ছু'একজন শুভানুধ্যায়ী মনীন্দ্রকে কলকাতায় চিঠি লিখেও জানিয়েছিল যে বুড়ীর হাতটান আছে, ওকে যায়গা দিলে ক্ষতি হবে।

এক বেলা ছুটো আহারের সংস্থান করতে না পেরেই যে বুড়ী ঐভাবে এটা ওটা সেটা টান দিত এ'কথাটা কেউ বুঝতে চাইত না।

অবশেষে মনীন্দ্রকে নিয়ে শৈলবালা যখন আবার বাড়ি ফিরে এল তখন এই বুড়ীই যথাসাধ্য করতে লাগল ওদের জন্য। অজয়তো সব সময় বুড়ীর কাছেই থাকত। বুড়ীকে সবাই কানুর'মা বলে ডাকত কিন্তু কানু বলে যে বুড়ীর কোন ছেলে ছিল তাকে কেউ দেখে নাই এ গাঁয়ের।

বুড়ী অজয়কে গল্প শুনাত। কত সাত ভাই চম্পার গল্প, ঘুঁটে কুড়ুনীর গল্প, বেঙ্গমাবেঙ্গমীর গল্প, চাঁদের মা বুড়ীর গল্প। অজয় বুড়ীর কোলে বসে সেই সব রূপকথার গল্প শুনত।

মাস ছ'য়েক এইভাবে চলবার পর একদিন সকালে মনীন্দ্রর হঠাৎ কাসতে গিয়ে নাক মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। শৈল ছুটে এসে স্বামীকে মুখে চোখে জল দিয়ে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেল কিন্তু আবার রক্ত উঠতে লাগল। শৈল চীৎকার করে কানুর মাকে ডাকল, তারপর—

তারপর সব শেষ। মনীন্দ্র এ পৃথিবীর মায়া, স্ত্রীপুত্র সবারই মায়া পরিত্যাগ করে চলে গেল।

দুই

দুঃখের দিনও কাটে। শৈলবালার দিনও তাই কাটতে লাগল। শৈলর চিঠি পেয়ে তার দাদা শশিকান্ত এসে শ্রাদ্ধের ক'দিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ কর্ম দেখে শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে একদিন বোনকে বলল "আমি তো আর বেশী দিন এখানে থাকতে পারছি না বোন, এবার আমাকে যেতে হবে।" শৈল বলল "একা একা এ বাড়িতে কি করে থাকব দাদা, তুমি যদি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও তো খুব ভাল হয়।"

শশিকান্ত বিষয়ী লোক। এ কদিন বোনের বাড়ীতে থেকে ওদের বিষয় সম্পত্তি কোথায় কি আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিয়ে জানতে পেরেছে যে ভাল করে দেখাশুনা করলে শৈল আর তার ছেলেটির খাওয়া পরা ঐ সম্পত্তির আয় থেকেই চলে যেতে পারে। তাই বোনের অনুরোধে আগ্রহের সঙ্গেই সে বলল "তা বেশ তো, যদি কিছুদিন আমার ওখানে থাকতে চাও সে তো ভালই, আর এ কথাতো সত্যিই যে এই পুরীতে কেই বা তোমাদের দেখাশুনা করবে আর কেই বা করবে তোমার বিষয় সম্পত্তির তদারক। তা তুমি যদি আমার ওখানে যেতে চাও আমার তাতে আপত্তি নাই। হাজার হলেও মা'র পেটের বোনকে তো আর আমি ফেলতে পারি না।"

এর পর একদিন শশিকান্ত গরুর গাড়ী ডেকে জিনিষপত্র সব বোঝাই দিয়ে বোন আর ভাগিনেয়কে সঙ্গে করে লক্ষ্মীপুর রওয়ানা দিল।

শশিকান্তর স্ত্রী ললিতা কিন্তু শৈলবালাকে ভাল চোখে দেখল না। তার ধারণা হল যে ওরা এসেছে তার স্বামীর ঘাড়ে চেপে বসবার মতলবে। প্রথম প্রথম তাই বিশেষ কিছু না হলেও যতই দিন যেতে লাগল ললিতার ব্যবহার ততই যেন খারাপ হয়ে উঠ্‌তে লাগল। এক বছর না যেতেই ললিতা কথায় কথায় শৈলবালাকে খোঁটা দিতে আরম্ভ করল। প্রথম প্রথম শৈলবালা মুখ বুঁজে থাকতে চেষ্টা করলেও অসহনীয় হয়ে উঠলে ক্রমশঃ সেও দু'এককথা শুনিয়ে দিতে ছাড়তো না ভাজকে। ক্রমশঃ ব্যাপার এমন হয়ে দাঁড়াল যে বাড়ীতে দিবা-রাত্রই যেন ঝগড়া কলহ লেগেই থাকত।

শশিকান্তর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তার দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে নিরুপমার বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে অনুপমা অজয়ের বয়সী। মাঝে একটি ছেলে হয়েছিল কিন্তু সে শিশুকালেই মারা যায়। ললিতা বাড়ীতে কোন ভালমন্দ খাবার এলে লুকিয়ে নিজের মেয়েকে খাওয়াতো, অজয়কে দিত না। অনু কিন্তু মায়ের চাইতে পিসীর কাছেই থাকতে ভাল-বাসত। মা কোন কিছু লুকিয়ে তাকে দিলে সে আবার সেগুলো লুকিয়ে এনে অজয়কে ভাগ করে দিত। এই নিয়েও ননদ ভাজে প্রায়ই ঝগড়া ঝাটি হ'ত।

একদিন কি একটা কথায় ললিতা শৈলবালাকে যা নয় তাই বলে গালাগালি দিলে শৈলবালা দাদাকে বলল, "দাদা! আর তো এখানে থাকা চলছে না। বৌদি যা আরম্ভ করেছেন তাতে এখানে থাকা অসম্ভব, আমাকে বরং তুমি আমার বাড়িতেই পাঠিয়ে দাও।"

শশিকান্ত মতলবে ছিল বোনের সম্পত্তি টুকু কি করে গ্রাস করবে। এখন বোন যদি চলে যায় তাহলে সে আর হয় না এই ভেবে সে স্ত্রীকে শাসন করতে গিয়ে কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে তাকে প্রহার করে বসল। ললিতা কেঁদে কেটে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলল। এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে শশিকান্ত রাগ করে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেল। শৈলবালাও ব্যাপার এতদুর গড়াতে দেখে আর এখানে থাকা উচিত নয় ভেবে নিজেই গরুর গাড়ী ডেকে অজয়কে নিয়ে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এল।

অজয় ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল। শৈলবালা কান্নুর মা'র সহায়তার আর ক্ষেতের ফসলের আয়ে কোনরকমে দিন চালাতে লাগল। জমিগুলি ভাগচাষীদের কাছে বর্গা দিয়ে যে ফসল পাওয়া যেত তাতেই তাদের সম্বৎসরের চাল ডাল হয়ে যেত। কিছু সরষে, গম, যব আর কাওনও পাওয়া যেত। ও থেকে কলুদের বাড়ীতে সরষে ভাঙ্গিয়ে তেল, গম ভেঙ্গে আটা যবের ছাতু, আর কাওনের ছাতু করে রাখত শৈল। গ্রামে গোপালের মা বলে এক দুঃস্থা স্ত্রীলোক ছিল, সে ধান ভেনে

চিড়ে কুটে, মুড়ি ভেজে দিন চালাতো। শৈল তাকে দিয়ে চিড়ে মুড়ি, মুড়কী তৈরী করিয়ে মাটির বড় বড় হাঁড়ীতে তুলে পাটের বুনানো শিকেয় ঝুলিয়ে রাখতো। বাড়িতে কয়েকটা খেজুরের গাছ ছিল সেগুলো থেকেও শীতকালে যে রস পাওয়া যেত তা জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করে রাখত শৈল। বাড়ির উঠানের পাশে শৈল নিজহাতে বেগুন, লঙ্কা, আলু, সীম, লাউ, কুমড়া ঝিঙ্গে, শশা ইত্যাদি লাগিয়ে বেশ তরিতরকারি উৎপন্ন করত।

শৈলর অসুবিধা বা কষ্ট হ'ত কাপড়, লবণ, কেরোসিন তেল, নারকেল তেল, মশলা প্রভৃতির জন্য কারণ ওগুলো বাজার থেকে না আনলে মিলত না। সপ্তাহে দুইদিন হাট বসতো পাশের গাঁয়ে। শৈল একে ওকে বলে কয়ে হাট করিয়ে নিত। এই ভাবেই দুঃখে কষ্টে তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল।

অজয়ের হাতে খড়ি দেওয়া হল একদিন ভাল দিন দেখে। তারপর শৈল নিজেই "বর্ণ পরিচয়" কিনে এনে অজয়কে বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিতে আরম্ভ করল। সকালে কিছু মুড়ি আর গুড় দিয়ে অজয়কে জলখাবার খাইয়ে শৈল বই নিয়ে বসত, বলত—

"অজগর আসছে তেড়ে,
আমটি আমি খাব পেড়ে,"

অজয় মা'র সঙ্গে সুর করে পড়ত "অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে" এরপর অজয় শেখে "কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি" এইভাবে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ আর ধারাপাত শেষ হয়ে যায় অজয়ের।

অজয়কে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেয় শৈলবালা। বিকালে বই শ্লেট বগলে করে অজয় যখন বাড়ী ফেরে, শৈলবালা বলে "হাত মুখ ধুয়ে এসো, মুড়কী খেতে দিচ্ছি তোমাকে।"

কখনও কখনও শৈলবালা ছেলেকে তার বাবার কথা বলে। বাবা কত বড় চাকরি করতেন, কলকাতায় বাসা ছিল তাঁর। সেখানে আছে তার সুনন্দা মাসী, রানু, কমলা, নরেন, হাবু, ওরাও তার মত এতদিন স্কুলে পড়ছে। বড় হলে খোকন কলকাতায় যাবে। ছোট্ট টুকটুকে বউ আসবে খোকনের।

ভবিষ্যতের রঙিন জাল বোনে শৈলবালা।

এমনি করেই দিন কাটছিল, হঠাৎ শৈলবালার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়। জ্বরগায়েই সে সংসারের কাজকর্ম করতে থাকে। তিনদিন না যেতেই তার জ্বর খুব বেড়ে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে কাশি আর বুকে ব্যথা। অজয় মহকুমা সহরে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলে "নিউমোনিয়া হয়েছে, খুব সাবধানে থাকতে হবে"। অজয় ডাক্তারের সঙ্গে গিয়ে ঔষধ নিয়ে আসে।

দুদিন পরে শৈলবালার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। কানুর মা তখন অজয়কে পাঠায় তার মামার বাড়িতে খবর দিতে। খবর পেয়ে শশিকান্ত আসে। শশিকান্ত চেষ্টার ত্রুটি করে না। "এম, বি," ডাক্তারকে "কল" দেয় সে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

একদিন বিকালে শৈলবালা শশিকান্তকে বলে—"দাদা আমি চললাম, রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে উনি এসে আমাকে ডাকছেন, আমি আর বাঁচব না, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, ওকে তুমি দেখো।"

শশীকান্ত বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "তুমি শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাবে বোন, কেন ওসব কথা ভাবছ।" শৈলবালা বলে—"না দাদা, আমি বুঝতে পারছি আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে, তুমি আমাকে কথা দাও খোকনকে তুমি দেখবে, আমাদের যা বিষয় সম্পত্তি আছে ওতে খোকনের ভালই চলে যাবে দাদা, কেবল ওর দেখবার কেউ থাকবে না বলেই তোমাকে বলছি।"

শশীকান্ত বলে "একথা কি আর বলতে হয় বোন, তোমার ছেলেকে আমি নিজের ছেলের মতই দেখব।"

তার পরদিনই শৈলবালা শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে হয়তো বা তার স্বামীর কাছেই চলে গেল।

হতভাগ্য অজয় শৈশবেই অনাথ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মামার সঙ্গে চলে গেল বাড়ি ছেড়ে।

তিন

এই ঘটনার পর তিনটি বৎসর কেটে গেছে। অজয় এখন মামার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ে। পড়া তার হয়তো হ'ত না কিন্তু অজয় নিজেই হেডমাষ্টার মশাইকে

হাতে পায়ে ধরে 'ফ্রী'তে পড়বার সুবিধা করে নিয়েছিল। মাইনে লাগলে হয়তো তার লেখাপড়া হ'তই না কারণ তার মামা শশীকান্ত ছিল ভয়ানক কৃপণ। টাকা খরচ করতে হবে এরকম কাজ সাধ্যমত সে করত না। টাকা খরচের ভয়ে তার বড় মেয়ে নিরুপমাকে সে এক পাগল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। প্রথম কয়েক বৎসর সে বেশী পাগলামি না করলেও পরে এমন আরম্ভ করল যে তাকে শিকল দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখতে হ'ত। একদিন সে কি করে ছাড়া পেয়ে গ্রামের একটি ছেলেকে মারাত্মক ভাবে আঘাত করে। এরপর গ্রামের সকলে মিলে থানায় খবর দিলে দারোগা এসে নিরুপমার স্বামীকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। ওখান থেকে হাকিমের কাছে নিয়ে গিয়ে পাগল বলে প্রথমে তাকে স্থানীয় জেলখানায় কিছুদিন রেখে পরে রাঁচির পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেয়।

তার কিছুদিন পরেই নিরুপমা একদিন বাড়িতে এসে কেঁদে বলে যে সে আর শ্বশুরবাড়ি যাবে না। সেখানে সবাই নাকি বলে যে "ঐ ডাইনী বউ এসেই ছেলেকে কি সব খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে।"

অজয়ের বয়স তখন মাত্র আট বৎসর। এই বয়সেই সে ক্লাস 'ফোর'-এ পড়ে। মামা তাকে একটা পয়সাও সাহায্য করত না, এমনকি বই খাতা, কলম, পেনসিল কিনতে যে টাকা লাগত শশীকান্ত সে টাকাও দিত না। অজয় কখনও চাইলে

বলতো "টাকা কোথায় পাব ! বিনা পয়সায় পার তো পড়, না হলে লেখাপড়া শিখে দরকার নাই ।"

গ্রামের পশ্চিম দিকে কতকগুলো পড়ো ভিটে ছিল। এক সময় ঐ সব ভিটেতে জনবসতি ছিল। এখন সেগুলো জঙ্গল আর অগাছায় মিলে প্রায় বনের মত হয়ে পড়েছে। ঐ জঙ্গলে অনেক আম, কাঁঠাল, সুপারি আর নারকেলের গাছ ছিল। ঘোষেদের বাড়ির মনুকে সঙ্গে নিয়ে এক রবিবার অজয় সেই জঙ্গলে গিয়ে অনেকগুলো সুপারি পাড়ল। গাছে চড়তে গিয়ে বুকের কয়েক যায়গায় ছড়ে যায় অজয়ের।

বিকালবেলা ঐ সুপারিগুলো হাটে নিয়ে বিক্রি করে ওরা প্রত্যেকে একটাকা ন'আনা করে পায়। হাট থেকে ফেরবার পথে অজয় বলে "সামনের রবিবার আবার ! কি বলিস ?"

উৎসাহের সঙ্গে মনু সম্মতি দেয় এই লাভজনক খেলার কথায়।

এইভাবে টাকা জমিয়ে অজয় খাতা, বই প্রভৃতি দরকারী জিনিস পত্র কিনত। মামা জিজ্ঞাসা করলে অম্লান বদনে সে মিথ্যা কথা বলত যে "স্কুল থেকে দিয়েছে।"

বাড়িতেও অজয়কে অনেক কাজ করতে হ'ত। সে গরুর ঘাস কাটত, পুকুর থেকে জল আনত, হাট বাজার করত, তাছাড়া মামার তামাক সেজে দেওয়া, বাগান কোপানো, কাঠ কেটে দেওয়া ইত্যাদি সংসারের আরও অনেক ফাইফরমাস খাটত। এত করেও কিন্তু মামা মামীর মন সে পেত না।

পাড়ার ছেলেরা যখন বিকাল বেলা স্কুল থেকে ফিরে ফুটবল খেলতে মাঠে যে'ত অজয় তখন হয়তো গরুর জন্য ঘাসপাতা কাটতো। ছেলেদের খেলতে যেতে দেখে তার মনটা উতলা হয়ে উঠতো। তার বড্ড ইচ্ছা হ'ত ওদের মত মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলতে। একদিন সে দলের ক্যাপ্টেন ভূপেনের কাছে গিয়ে বল'ল যে সে ক্লাবে খেলতে চায়। ভূপেন বল'ল যে চার আনা চাঁদা দিতে হবে ক্লাবে, ভর্ত্তি হতে হলে। অজয়ের কাছে তখন একটা পয়সাও ছিল না। তার তখন প্রথম ও প্রধান চিন্তা হ'য়ে উঠলো কি করে সে ঐ চার আনা পয়সা জোগার করবে। সুপারি বিক্রি করলে হ'ত কিন্তু গাছে আর সুপারি নাই। অজয়ের মাথায় তখন এক মতলব এসে গেল। তাদের নিজেদের বাড়িতে এক কাঠের সিন্দুকের মধ্যে কিছু কাঁসার বাসনপত্র আছে, তা থেকে একখানা নিয়ে বিক্রি করতে পারলে হয়তো হয়। বাড়ির চাবি তার মামার কাছে থাকলেও সে ওগুলো নিজের চাবির সঙ্গে না রেখে ঘরে একটা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখ'ত। স্কুলে তখন গরমের ছুটি। অজয় একদিন সুযোগ মত ঐ চাবি নিয়ে নিজের বাড়িতে এসে সিন্দুক খুলে দেখতে পায় যে সিন্দুক প্রায় খালি হয়ে পড়েছে। কিছু বাসনপত্র যা তখনও ছিল তা থেকেই একখানা থালা বার করে নিয়ে অজয় বাজারে গিয়ে সেখানা বিক্রি করে এক টাকা চার আনা পায়। পরদিনই ভূপেনের কাছে গিয়ে অজয় ক্লাবের চাঁদা

চার আনা দিয়ে যথারীতি মেম্বার হয়ে যায় ক্লাবের। কিন্তু মেম্বার হলেও রোজ খেলতে যাওয়া তার ভাগ্যে জুট'ত না। একটা না একটা কাজে প্রায়ই সে আটকা পরে যেত!

স্কুলের ছেলেদের অনেকেই তখন বয়স্কাউট হচ্ছে। অজয় একদিন স্কাউট মাষ্টার চারু বাবুর কাছে গিয়ে বল'ল "স্যার আমাকে স্কাউট করে নিন।"

চারু বাবু বললেন "বেশ'ত, তুমি পোষাক তৈরি করে নিয়ে এসো, আমি তোমাকে ভর্ত্তি করে নেব।" বয়স্কাউট হতে হ'লে খাকী হাফসার্ট, হাফপ্যাণ্ট, খাকী সাইকেল-মোজা, জুতা আর একখানা লম্বা বাঁশের লাঠি লাগে। টুপি, ব্যাজ, স্কার্ফ আর ছুরি স্কুল থেকেই দেওয়া হয়।

অজয় সেদিন ভয়ে ভয়ে মামাকে বল'ল "আমি বয়স্কাউট হব মামা।"

শশিকান্ত জিজ্ঞাসা কর'ল "সে আবার কি?"

অজয় বল'ল "বয়স্কাউট, সে খুব ভাল, কত কিছু শিখতে পাব স্কাউট হলে, চারুবাবু বলেছেন যে খাকী সার্ট, প্যাণ্ট আর মোজা হলেই চলবে, আর সব স্কুল থেকেই দেবে।"

শশিকান্ত বল'ল "যা জামা কাপড় আছে ঐ নিয়েই স্কাউট হওগে, ওসব খাকী জামা প্যাণ্টুল কিনে টিনে দিতে আমি পার'ব না।"

ম্লান মুখে অজয় ফিরে আসে।

অনুপমা জিজ্ঞাসা করে "কি হয়েছে রে অজয়! অমন মুখ ভার করে রয়েছিস কেন?"

অজয় বলে "না কিছু হয় নাই।"

অনুপমা। "আমাকে বলবি না?"

অজয়। "মামাকে বললাম একটা খাকী হাফসার্ট, একটা প্যাণ্ট আর মোজা কিনে দিতে, বয়স্কাউট হ'তে হলে ওগুলো চাই যে, কিন্তু মামা দিতে পারবেন না বললেন।"

অনুপমা। "বয়স্কাউট কিরে?"

অজয়। "জানিস না? তা তুই কেমন করে জানবি! স্কুলে যারা বয়স্কাউট হয় তারা সব মিলিটারী পোষাক পড়ে, গলায় স্কার্ফ বেঁধে লাঠি নিয়ে মার্চ করে।"

অনুপমা। "কত লাগবে রে?"

অজয় হিসাব করে বলে "তা প্রায় চার টাকা লাগবে।"

অনুপমা। "মা রান্না ঘরে এক জায়গায় টাকা লুকিয়ে রাখে আমি জানি, এনে দেব সেখান থেকে?"

অজয়। "না'রে তাহলে তোকেও মারবে আমাকেও মারবে।"

অজয়ের মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। স্কুলে অজয়ের এক বন্ধু ছিল তার নাম শরদিন্দু। অজয় তার কাছে সব কথা বলতো। সেদিন ক্লাশে অজয় মুখখানা ভার করে আছে দেখে শরদিন্দু জিজ্ঞাসা কর'ল "কি হয়েছে রে অজয়, অমন মুখ ভারী করে আছিস কেন আজ?"

অজয় বলে "মামার কাছে একটা খাকী সার্ট, প্যাণ্ট আর মোজা চেয়েছিলাম বয়স্কাউট হবো বলে, তিনি দিবেন না বললেন।"

শরদিন্দু। "তোর মামা বুঝি তোকে কিছুই দেয় না ?

অজয়। "হ্যাঁ ভাই, স্কুলের বই খাতাও আমি নিজের পয়সায় কিনি, এক বাগান থেকে সুপারি পেড়ে বিক্রি করে সেই টাকায় বই খাতা কিনেছিলাম কিন্তু এখন আর সেখানে সুপারি নাই।"

শরদিন্দু "আমি তোকে আমার একটা খাকী সার্ট আর হাফপ্যাণ্ট দিতে পারি। আমার দুটো করে আছে।"

অজয়। "তোর বাবা বলবেন না কিছু ? "

শরদিন্দু। না ভাই বাবা আমাকে কিছু বলেন না। কিন্তু আমার কাছে তো মোজা বেশী নাই, তুই মোজা কিনতে পারবি তো ?

সোৎসাহে অজয় বলে যে সে মোজা কিনতে পারবে।

অজয়ের কাছে তখনও থালা বিক্রী করা একটাকা ছিল তাই দিয়ে সে মোজা কিনে নিয়ে গেল সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি যাবার সময়। বাড়িতে গিয়ে একখানা কাটারি নিয়ে বাঁশবনের মধ্যে ঢুকে একখানা শক্ত সরু বাঁশ কেটে এনে চেঁছে ছুলে লাঠি তৈরি করে ফেল'ল সে।

পরদিন শরদিন্দু সার্ট আর প্যাণ্ট এনে দিলে অজয় চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করে জানায় যে তার সব জোগার

হয়ে গেছে। চারুবাবু তখন তাকে একটা সেফটিপিন আঁটা ফিতের ব্যাজ দিয়ে বললেন, "তুমি 'আউল' দলে ভর্ত্তি হলে, এই চিহ্ন হচ্ছে আউল দলের।" তারপর একটা টুপি, একখানা স্কার্ফ আর একখানা ছুরি দিয়ে বললেন "তোমার বেল্ট আছে তো ?"

অজয় বলে "বেল্ট তো স্যার কিনতে পারি নাই।"

চারুবাবু বললেন "আচ্ছা বেল্ট তোমাকে আমি দিচ্ছি, এই নাও।"

ছুটির পর সেই প্রথম পোষাক পড়ে অজয় স্কাউটদের সঙ্গে স্কুলের মাঠে গেল। মনে তার কি আনন্দ! চারুবাবু সেদিন তাকে স্কাউটের তিন আঙ্গুল দিয়ে সেলুট করবার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। আর শিখিয়ে দিলেন স্কাউটের মটো "Scouts' honour is to be trusted."

পোষাক পড়ে, লাঠি কাঁধে নিয়ে জুতা পায় দিয়ে মস্ মস্ করতে করতে বাড়ি ফির'ল অজয়। অনু বল'ল "পোষাক পড়ে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোকে, যেন গট্ মট্ করা সাহেব!"

তিন মাসের মধ্যেই অজয় সিগনালিং, ফার্ষ্ট এড্ এবং আরও অনেক কিছু শিখে নিয়ে টেণ্ডারফুট ব্যাজ পেয়ে গেল।

চার

এদিকে শশিকান্ত অজয়ের বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করবার ফিকিরে ছিল। চার বছর পর পর জমিদারকে খাজনা না দিয়ে বাকি খাজনার দায়ে নিলামে উঠিয়ে শশিকান্ত বেনামীতে সেই সম্পত্তি কিনে নিলো। ওদের বাড়ির তৈজসপত্র ইতিমধ্যে সবই প্রায় শেষ করে ফেলেছিল সে। বাকি ছিল শুধু ঘর ক'খানা। ওগুলো ভেঙ্গে নিতে গেলে লোকে কি বলবে এই ভেবেই বোধ হয় ঘর ক'খানা আর বিক্রি করে নাই সে.

এদিকে তার ছোট মেয়ে অনুপমাও বেশ বড় হয়ে উঠছে। বড় মেয়েকে এক পাগল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া নিয়ে তাকে প্রায়ই স্ত্রীর কাছে কথা শুনতে হয় তাই ছোট মেয়ের বিয়ে একটু দেখেশুনে দিবার ইচ্ছা শশিকান্তর। তবে ঐ ইচ্ছা পর্য্যন্তই, টাকা খরচ করে বিয়ে সে দেবে না কিছুতেই। একটা বিষয়ে শশিকান্ত ভাগ্যবান ছিল—তার দুটি মেয়েই ছিল পরমা সুন্দরী।

অনুপমার বয়স তখন প্রায় বার বৎসর। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া পাঠশালার ক্লাস থ্রি পর্য্যন্তই শেষ। সে এখন পান খেতে শিখেছে। সময় সময় পাকা পাকা কথাও বলে সে সমবয়সীদের কাছে। পাড়াগাঁয় বার বৎসর বয়সেই অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, তাই শ্বশুর বাড়িতে কার সঙ্গে

কেমন ব্যবহার করতে হয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি সম্বন্ধ এসব কথা ওদের নয় দশ বছর বয়স থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে অন্তঃসত্বা হয়ে ছেলের মা হয়েছে এরকম ঘটনাও দেখতে পাওয়া যায় পাড়াগাঁয়ে।

একটু বড় হলেই পাড়াগায়ের মেয়েরা বউ বউ খেলা করে। প্রথমে ওরা পুতুলের বিয়ে দিয়ে বিয়ের তালিম পেতে থাকে, পরে ওরা নিজেরাই কেউ বর সেজে, কেউ বউ সেজে আবার কেউবা এয়ো সেজে বিয়ের মহড়া দিতে থাকে। অনুপমার জীবনেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কোন কিছু ছেলেমানুষি করলেই তার মা বলে উঠতো "বুড়ো ধারী মেয়ে আজ বাদে কাল শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে, এখনও কচি খুকীর মত খেলা।"

অজয় তখন ক্লাস 'এইট'এ উঠেছে। লেখাপড়ায় অজয় খুবই ভাল ছিল। প্রতি বৎসরই সে ফার্ষ্ট হয়ে প্রোমোশন পেয়ে আসছে। হেড মাষ্টার অজয়কে খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস'ত অজয়। মামা সর্বদাই নিজের বিষয় কর্মে ব্যস্ত থাকত তাই অজয় কি করে না করে কোন খোঁজই নিতো না সে। মামীর স্বভাব ছিল অতি-মাত্রায় খিটখিটে। কথায় কথায় অজয়কে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতে কোনদিনই সে ছাড়'ত না কিন্তু এই পরিবেশ অজয়ের সহ্য হয়ে গিয়েছিল। পড়তে পড়তে উঠে সংসারের কাজ করে দেওয়া, গরুর জন্য টবে জল দেওয়া, বাজার হাট করে দেওয়া এসব যেন তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

গরমের দিনে বাড়ির পুব দিকে পুকুরের পাড়ে ভাঁটি জঙ্গলের মধ্যে খুব বড় বড় দুটো কালোজাম গাছ ছিল। অজয় থলে নিয়ে সেই গাছে উঠে জাম পেড়ে থলে ভর্ত্তি করে বাড়িতে নিয়ে আস'ত। গাছে উঠে জাম খেতে খেতে তার দাঁত আর জিভ কালো হয়ে যেতো।

বাড়িতে এনে অনু আর সে জামগুলিকে ধুয়ে একটা বড় পাথরের বাটিতে নুন আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মেখে খানিকটা নিয়ে নিরুদিদি আর মামীকে দিতো। মামী জাম মাখা দেখে খুশী হয়ে বলতেন "বেশ মেখেছিস্ তো, কখন পাড়লি?"

অজয় বলে—"এই তো পেড়ে নিয়ে এলাম। কাল আবার আনবো, কেমন মামীমা?"

দুপুর বেলা টো টো করে বনে জঙ্গলে ঘুড়ে কোথায় গোলাপ জাম, কোথায় নোনা এইসব টুকিয়ে বেড়াতো অজয়। এ কাজে তার নিত্য সহচরী ছিল তার বোন অনুপমা।

এমনি ভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল অজয়ের, কিন্তু এই সময় একদিনের একটা ঘটনায় তার জীবনে এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল। এই মহাপ্রলয়ে সে মামার সংসার থেকে ছিট্‌কে চলে গেল—বহুদূরে·····

সেদিন স্কুলে যাবার সময় শশিকান্ত অজয়কে বলে দিল "আজ একটু সকাল সকাল বাড়িতে ফিরো—কাজ আছে।" অজয় জান'ত যে মামার কথা না শুনলে রক্ষা থাকে না। সাধারণতঃ শশিকান্ত কাউকে কিছু বলে না কিন্তু কোন

কারণে রেগে গেলে সে তখন পশুর চেয়েও অধম হয়ে ওঠে। তার হুকুম মত কাজ না হলে সে কাউকেই রেহাই দেয় না। অজয়কে এর আগেও একবার কি একটা কথা মত কাজ না করার জন্য অমানুষিক প্রহার করেছিল সে।

সেদিন ছিল শনিবার। স্কুলে যেয়ে অজয় শুনতে পেলো যে সেই দিনই অন্য এক স্কুলের সঙ্গে তাদের ফুটবল ম্যাচ হবে। ক্লাসের ছেলেরা সবাই ছুটির পরে ম্যাচ দেখতে চল'ল। অজয় একবার ভাব'ল যাবে না আবার ভাব'ল যে "গেলেই বা! মামাকে বললেই হবে যে স্কুলে ফুটবল ম্যাচ ছিল তাই দেরী হয়ে গেছে।"

এইসব ভেবে সে ম্যাচ দেখতে যাওয়াই স্থির কর'ল। মাঠে গিয়ে দেখে যে ইতিমধ্যেই মাঠের দুইদিকে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। কত হৈচৈ, কোলাহল, আনন্দ, হাততালি, গোল গোল বলে চীৎকার, উত্তেজনায় তার পা অজ্ঞাত সরেই উঠে যায় কোন কঠিন সট্ করে যখন তাদের স্কুলের ব্যাক আনোয়ার। মাখন কি সুন্দর স্কোর করছে? ঐ ঐ বলটা রাইট উইঙে ফনি ধরে ফেলেছে, এইরে ওদের পক্ষের একজন শ্লীপ কেটেছে—যাক্ বাঁচা গেল। ফণি লাফ দিয়ে সরে পড়েছে বল নিয়ে। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের পায়ের কাছে বল! "পাস্ ইট্" ঠিক পাস করেছ; ওদের ব্যাক্‌টা ছুটে আসছে। "ওয়েল ডান, ওয়েল ডান" দেবেন, সত্যরঞ্জন কীক্ করছে—একেবারে গোলের

মাঝখানে! গোল কীপার পড়ে গেছে, চারদিকে চীৎকার—"গোল" "গোল"। কেউ লাফাছে, কেউ ছাতা খুলে ছুড়্ছে, কেউ রুমাল ছুঁড়ে ফেলছে মাথার উপরে। রেফারী লম্বা হুইসিল দিল। খেলা শেষ। অজয়দের স্কুল এক গোলে জিতেছে। আনন্দ কোলাহলের মধ্যে অজয় মাঠ থেকে ফিরে এলো।

বাড়ি ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। উঠানে পা দিতেই শশিকান্ত ডাক'ল "এদিকে শুনে যাও!"

অজয়ের বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। এগিয়ে আসতেই কর্কশকণ্ঠে শশিকান্ত জিজ্ঞাসা করে "এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল?"

অজয়ের মুখে কথা জড়িয়ে আসে। সে বলে "ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম মামা, আজ আমাদের স্কুলের সঙ্গে রাসবিহারী হাইস্কুলের ম্যাচ ছিল·········"

"তবে রে হারামজাদা ছেলে, দাঁড়াও তোমার ম্যাচ দেখাচ্ছি" এই বলে শশিকান্ত এক লাফে ঘরের দাওয়া থেকে নেমে এসে অজয়ের গালে এক বিরাট চড় বসিয়ে দিল। চড় খেয়ে অজয়ের মাথার মধ্যে বন্ বন্ করে উঠ'ল। তার হাত থেকে বই খাতাগুলো উঠানের মধ্যে ছিট্কে পড়ে গেল।

অজয় বইখাতাগুলো কুড়িয়ে তুলতে যেতেই শশিকান্ত পা থেকে একখানা খড়ম খুলে নিয়ে তাই দিয়েই অজয়কে নির্দয়ভাবে প্রহার করে চল'ল। অজয়ের আর্তচীৎকারে

বাড়ির সবাই ছুটে এল কিন্তু কর্তার হাত থেকে কেউ ওকে রক্ষা করতে পার'ল না। অনুপমা কেঁদে উঠে বল'ল—"মা, বাবা যে ওকে মেরে ফেল'ল।"

ললিতা বল'ল "তা আমি কি কর'ব। ওঁর কথা শুন'ল না কেন বদমাইস ছেলে।"

মার খেয়ে অজয়ের আর উঠবার শক্তি ছিল না। অনেকক্ষণ সে পড়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে বস'ল। ব্যথায় তার সর্বশরীর টন টন করছে। অজয়ের চোখে জল এসে পড়'ল। মায়ের কথা মনে হ'ল তার। বইখাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে ঘরের দিকে যেতেই শশিকান্ত গর্জ্জে উঠ'ল—"এ বাড়িতে আর তোমার স্থান হবে না, তুমি ম্যাচ দেখতেই যাও।"

সেদিন সকালে সে মাত্র দুটি মুড়ি খেয়ে স্কুলে গিয়েছিল কারণ তার মামীর শরীর খারাপ বলে সকাল সকাল ভাত রান্না করা হয়ে ওঠে নাই সেদিন। সারাদিন একরকম অনাহার তার উপর এই অমানুষিক প্রহার। অজয় ভাবে যে এ বাড়িতে সে আর থাকবে না। সরস্বতী পূজায় স্কুলে একবার ধ্রুব প্লে হয়েছিল। অজয় ধ্রুবর কথা মনে কর'ল। মনে মনে অজয় বল'ল "পদ্মপলাশলোচন হরি, ধ্রুবর মত আমাকেও কি তুমি দেখবে না?"

অজয় ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বার হয়ে যায়। সেদিন ছিল অমাবস্যা তার উপর বর্ষাকাল। আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। জলকাদায় পিচ্ছিল রাস্তা।

বাড়ির বাইরে এসে একটু দাঁড়িয়ে মনে সাহস সঞ্চয় করে অজয় সেই কর্দমাক্ত পথ দিয়ে চলতে সুরু কর'ল। একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাবার সময় কি যেন খস্‌খস্‌ করে উঠল। ভয়ে অজয়ের গায়ে কাঁটা দেয়। দ্রুতপদে চলতে গিয়ে সে পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। জামা কাপড় কাদায় ভর্ত্তি হয়ে যায় তার, তবুও সে চলে। আরও কিছুদূর যেতেই আকাশ চিরে বৃষ্টি নাম'ল। গাছের পাতায় টপ টপ করে বৃষ্টির ফোটা পড়বার শব্দ শুনতে পায় অজয়। দেখতে দেখতে সাত'শ রাক্ষসীর মত প্রলয়ংকর শব্দে চরাচর ডুবিয়ে ঝড় আসে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। গাছে গাছে যেন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। এই দুর্য্যোগে অজয় চলেছে অন্ধকারে পা টিপে টিপে, সামনে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

পাঁচ

স্কুলের বোর্ডিং হাউসে তখন সবেমাত্র রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। রাত তখন প্রায় ন'টা। ছেলের দল কলরব করতে করতে যে যার ঘরে যাচ্ছে, এই সময় অজয় এসে ওদের মধ্যে একটি ছেলেকে ডাক'ল—"শরদিন্দু!"

শরদিন্দু অজয়কে অত রাত্রে কাদামাখা জামাকাপড়ে দেখে জিজ্ঞাসা কর'ল, "কিরে! একি অবস্থা তোর?"

অজয় বল'ল—"ঘরে চল্ সব বলছি।"

শরদিন্দু অজয়কে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে এসে বলে "আগে তুই ভিজে জামাকাপড় বদলে নে, পরে শুনছি সব কথা!"

শুকনো জামাকাপড় পড়ে অজয় চৌকির উপরে উঠে বসতেই শরদিন্দু জিজ্ঞাসা কর'ল "কি ব্যাপার বলতো?"

অজয় আজকের ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে বল'ল "আমি আর ও বাড়িতে থাকব না?"

শরদিন্দু জিজ্ঞাসা কর'ল, "আজ তোর খাওয়া হয় নাই নিশ্চয়ই?"

অজয় বলল—"না।"

শরদিন্দু তখন বোর্ডিংএর চাকরকে ডেকে কিছু খাবার আনতে দিয়ে বল'ল—"তুই আমার কাছে থাক, আমার যে টাকা আসে ওতেই আমাদের দুজনের চলে যাবে।"

অজয়। না ভাই আমি কলকাতা যাব ঠিক করেছি।

শরদিন্দু। কলকাতা যাবি কি রে? কখনও গেছিস আগে কলকাতায়?

অজয়। না।

শরদিন্দু তখন অজয়কে কলকাতার কথা বলতে আরম্ভ করে। ওখানে কত গাড়ী, মোটর, বাস, ট্রাম, দোকানগুলো কেমন সাজানো গোছানো। আমাদের এখানকার মত লাঠি দিয়ে ঝাঁপ উঠিয়ে ওখানে দোকান করে না। রাস্তায় কত সাহেব, মেম, এদিকে রাস্তা ওদিকে গলি, সেদিকে ষ্ট্রীট, সে এক গোলক ধাঁধাঁ, তুই তো রাস্তাই চিনতে পারবি না।

অজয় বলে "এখানে মামার বাড়িতে পড়ে সারাজীবন লাথি ঝাঁটা খাওয়ার থেকে কলকাতায় যাই, ওখানে আর কিছু না হয় একটা কাজকর্ম জুটিয়েতো নিতে পার'ব।

শরদিন্দু। তোর কাছে টাকা পয়সা তো কিছুই নাই, ট্রেণের টিকিট কাটবি কি দিয়ে?

অজয়। বিনা টিকিটেই যাব, যা থাকে কপালে।

শরদিন্দু বলল "আমি তোকে পাঁচটা টাকা দিচ্ছি। আমার কাছে থাকলে আরও দিতাম কিন্তু আজ আর কিছুই নাই। যখন যাবিই ঠিক করেছিস তখন এক কাজ কর, আমার বিছানার তলা থেকে সতরঞ্চিটা তুলে নে আর একটা বালিস নে। জামাকাপড় তোর ভিজেগেছে, ওগুলো কাগজে জড়িয়ে বেঁধে নে। আমার কাপড় জামা যা পড়ে আছিস ওগুলোও থাক তোর কাছে।

অজয় বলল, "তোর কথা ভাই জীবনে ভুলতে পারব না।

চাকরটা এই সময় এক ঠোঙ্গা খাবার এনে দিল। শরদিন্দু কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে টেবিলের উপরে রেখে অজয়কে বল'ল "খেয়ে নে, এখন তো আর বোর্ডিংএ ভাত পাওয়া যাবে না।"

অজয় বন্ধুর দেওয়া সেই খাবার খেয়ে জামা কাপড় আর বালিশটাকে সতরঞ্জিতে জড়িয়ে বেঁধে শুয়ে পড়'ল শরদিন্দুর পাশে বোর্ডিংএর অপরিসর বিছানায়।

একটু পরেই শরদিন্দু ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু অজয়ের চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না।

রাত প্রায় চারটার সময় অজয় শরদিন্দুকে ডেকে তোলে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে সে বিরক্ত হয়ে বলে "এত রাত্রে ডাকলি কেন ?"

অজয় বলে "রাত কোথায়, আমার যাবার সময় হয়ে গেছে তাই তোকে ডেকে তুললাম।

শরদিন্দু ঘুম জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে "কোথায় যাবি ?"

অজয় বলে "বারে! সব ভুলে গেলি নাকি ? আমি কলকাতা যাচ্ছি যে।"

শরদিন্দুর ঘুমের জড়তা কেটে যায়। সে ধড়মড় করে উঠে বসে বলে "এখনই যাচ্ছিস্। পৌঁছেই চিঠি দিস আমাকে জানলি ?"

অজয় বলে "দেব"।

বিছানার বাণ্ডিলটাকে বগলদাবা করে অজয় ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। শরদিন্দু জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বন্ধুর চলার পথের দিকে। মনটা তার খারাপ হয়ে যায় অজয়ের জন্য।

স্টেসনে এসে অজয় দেখে যে ট্রেণ আসতে আর দেরি নাই। প্লাটফর্ম কোলাহল মুখরিত হয়ে উঠেছে। বাসি খাবারের ডালা মাথায় নিয়ে ভেণ্ডারের দল হাঁকতে আরম্ভ করেছে "চাই খাবার গ্রম" "চাই পুরী মিঠাই" "চাই……"

ঠেলাঠেলি করে অজয় টিকিট কিনে আনে। টিকিট কিনে প্লাটফর্মে আসতেই দেখতে পায় দূরে ট্রেনের সার্চলাইট এগিয়ে আসছে। ভোর হতে তখনও দেরি আছে।

ট্রেন এসে পড়ে। যাত্রীদের কোলাহল, "কুলীবাবু" "চা গ্রম", "চাই পায়েন ত্রি সিগ্রেট" "খাবার গ্রম" "ওরে এদিকে আয়রে" "পুঁটী কোথায় গেলিরে?" "বাবা ও বাবা" "সব নেমেছে তো," এই রকম বহু কণ্ঠের শব্দ একাকার হয়ে সচকিত করে তোলে স্টেসনটিকে। অজয় অভিভূতের মত ট্রেনে উঠে বসে। যাত্রীদের ওঠানামা শেষ হয়ে যায়, চীৎকার কোলাহল মন্দীভূত হয়ে আসে, টং টং করে ঘণ্টা বেজে উঠে, ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করে।

এক অজানা অনুভূতিতে অজয় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে আজ তার এতদিনের চেনা এই গাঁয়ের মাটির মায়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। কলকাতা কেমন তা সে জানে না, ওখানে

গিয়ে কি করবে! কোথায় উঠবে! কিছুই ঠিক নাই। একবার তার ইচ্ছা হয় ট্রেন থেকে নেমে পড়তে কিন্তু ট্রেন তখন পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে—নামা অসম্ভব। অজয় ভাবে কেন সে একাজ করে বস'ল, কিন্তু এখন আর উপায় নাই, যেতে তাকে হবেই।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই সে দেখতে পায় যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। একটা পুল পার হতেই সে দেখে—ঐ তো তার মামা বাড়ির পিছনের সেই লম্বা তালগাছ দুটো! গাছদুটো মাথা নেড়ে অজয়কে কি যেন বলছে, বোধ হয় ওকে বলছে "ফিরে এস অজয়, ফিরে এস।" মনে মনে অজয় বলে "না ভাই আমি আর তোমাদের কাছে ফিরে যেতে পারব না। মামা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যদি কোনদিন মানুষ হ'তে পারি তখন আবার ফিরে আসব, তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করব আবার।"

অজয় দেখতে পায় যে পুলের নিচে তার মামাবাড়ির গাঁয়ের শংকর মালো রাত্রে পেতে রাখা মাছ ধরবার যন্ত্রগুলি তুলছে। ট্রেন ছুটে চলে। অজয় শংকরের দিকে তাকিয়ে থাকে—"ঐ দেখা যায়, ঐ-ঐ, ঐ যাঃ মিলিয়ে গেল।" হয়তো জীবনে শংকরকে আর দেখতে পাবে না সে।

অজয়ের কত কথা মনে হয়। তার মামা মামীর কথা, ধলী গাইটাকে আর দেখতে পাবে না, মিনি বিড়ালটার ম্যাও ম্যাও ডাক আর শুনতে পাবে না, ভুলো কুকুরটাকে ওরা হয়তো

ঠিক মত খেতে দেবে না, অপরাজিতা ফুলের একটা গাছ লাগিয়েছিল অজয় সেটা বোধ হয় জল না পেয়ে শুকিয়ে যাবে, অনু বোধ হয় কাঁদছে, "লক্ষ্মী বোনটি আমার, কত দয়া, কত করুণা তোমার ঐ ছোট্ট হৃদয়খানিতে! তুমি আমার জন্য খুব কাঁদবে জানি কিন্তু কি করব বোন! মামা আমাকে যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল! আমার বাবা মা নাই কি না? তাই আমার এত কষ্ট! কিন্তু তোমাকে আমি ভুলব না বোন, মানুষ হয়ে আবার তোমার কাছে আসব।"

দূরে গাছের সারি যেন ধীরে ধীরে ঘুরছে। টেলীগ্রাফের থামগুলি তীরের মত একটার পর একটা পিছনের দিকে ছুটে চলেছে। মাঠের মাঝখানে জলায় শত শত পদ্মফুল ফুটে আছে। অনেকগুলি বক উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রভাতের মিষ্টি রোদে প্রান্তর ভরে গেছে। চোখে মুখে বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপ্‌টা এসে লাগছে। হঠাৎ ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে উঠে আসা কয়লার গুঁড়ো অজয়ের চোখে পড়ে। অজয় গাড়ীর মধ্যে মুখ নিয়ে এসে কোঁচার কাপড় মুখে পুরে ফুক দিয়ে গুঁড়োটা বার করতে চেষ্টা করে।

ছয়

কর্মব্যস্ত কলকাতা সহরের প্রবেশ দ্বার শিয়ালদা স্টেশন। ট্রেনের অপেক্ষায় শত শত নরনারী পোঁটলাপুঁটলি বাক্স বিছানা নিয়ে বসে আছে। টিকিট বিক্রির জানালার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা টিকিট কিনছে। ফেরীওয়ালা, রেল-পুলিশ, হোটেলগাইড, রিক্সা, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, হুইলারের ষ্টল, পানের দোকান, রেষ্টুরেণ্ট, বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার, ঘণ্টা, কোলাহল, চীৎকার এবং আরও অনেক কিছুতে মিশে খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে এখানে।

সন্ধ্যার একটু পরেই অজয়ের ট্রেনখানা শিয়ালদা পৌঁছে গেল। গেটে টিকিট দিয়ে বাইরে এসে এখানকার বিরাট ব্যাপার দেখে অজয় প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গেল। এত আলো! এত শব্দ! এত গাড়ীঘোড়া! মানুষ! বাপরে! উদ্‌ভ্রান্তের মত অজয় এদিক ওদিক তাকায়। একজন লুঙ্গী-পড়া মুসলমান এসে তার হাত ধরে টানে "আসুন খোকাবাবু, ঘোড়ারগাড়ী হবে?" কেউ ডাকে "রিক্সা চাই বাবু?" কেউ বলে "কুলী হবে?"

অজয় ওদের বলে যে তার কোন কিছুর দরকার নাই। রাস্তা পার হতে গিয়ে একখানা মোটর প্রায় অজয়ের গায়ের উপরে এসে পড়ে আর কি! ছুটে অন্যদিকে যেতেই এক বিরাট

বাস, সামনে ঘোড়ার গাড়ী, বাসের ড্রাইভার কঁ্যাচ করে গাড়ীর ব্রেক কসে অজয়কে ধমক দিয়ে বলে "গাড়ী দেখতে পাস না ছোকরা! এখনই তো চাপা পড়তিস্!"

আসে পাশে ভিড় জমে যায়, "কি হয়েছে মশাই?" "চাপা পড়ছে কি?" "বেঁচে আছে তো?" "বাঙ্গাল বোধ হয়?" এইরকম নানা প্রশ্ন। অজয় ভিড় থেকে বার হয়ে রাস্তা পার হয়ে ফুটপাতে উঠে আসে।

রেলের রাস্তার উপর দিয়ে ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে মাথায় তুটো আলো জ্বেলে এ কোন গাড়ী চলেছ! এটাই বুঝি ট্রাম! ট্রামের কথা অজয় আগে গল্প শুনেছে যারা কলকাতা আসত তাদের কাছে।

বাস কণ্ডাকটর হাঁকছে—"কালীঘাট, খিদিরপুর, ধরমতলা, মৌলালী!" এইসব দেখেশুনে এবং এই বিরাট সহরে কোথায় সে যাবে, কি করবে, কোথায় থাকবে সেই কথা ভেবে অজয় ভয় পেয়ে যায় মনে মনে। রাস্তার তুইধারে বড় বড় বাড়ি, শত শত দোকান, রাস্তায় শত শত গাড়ী, হাজার হাজার মানুষ আর তার মধ্যে অজয় একা। এই পৃথিবীর মাঝে আজ সে সত্যিই একা।

রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে অজয়। কত লোক তার পাশ দিয়ে চলে যায় কিন্তু তার মুখের দিকে কারো তাকাবার অবসর নাই। এখানকার মানুষরা যেন সব যন্ত্র, নিজের মনেই চলেছে দম দেওয়া ঘড়ির মত—যতক্ষণ দম থাকবে—চলবে তারপর একদিন দম ফুরিয়ে গেলেই অচল।

একটা দোকান থেকে এমপ্লিফায়ারে একটা জানা গান বেজে ওঠে। অজয় তাকিয়ে দেখে সুন্দর ভাবে সাজানো একখানা স্টেসনারী দোকান। ভয়ে ভয়ে সে দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়ে। বিছানাপত্রের বাণ্ডিল নিয়ে তাকে দোকানে ঢুকে পড়তে দেখে এক কর্মচারী জিজ্ঞাসা করে "কি চাই তোমার ?"

অজয় বলে "একটা কাজ !"

লোকটা হেসে ওঠে। অপ্রস্তুত হয়ে অজয় দোকান থেকে বার হয়ে আসে।

একটা হিন্দুস্থানী ছোকরা হাতে অনেকগুলো বোতাম নিয়ে রাস্তায় মোড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বিক্রি করছে "এক পয়সামে চার বোটাম, লেযা বড়িয়া চার বোটাম, লেযা বাবু চার বোটাম··· "

হাঁটতে হাঁটতে অজয়ের খিদে পায়। তার কাছে যে টাকা আছে ও থেকে বেশী খরচ করলে ভবিষ্যতে বিপদ হ'তে পারে ভেবে অজয় একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে চার পয়সার জিলিপি আর দুই গ্লাস জল খেয়ে আবার পথ চলতে থাকে। কোন রাস্তা দিয়ে কতক্ষণ হেঁটেছে কিছুই সে বুঝতে পারে না। হাঁটতে হাঁটতে সে এক অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ে। পা যেন আর চলতে চায় না তার। রাত তখন অনেক হয়েছে, রাস্তায় লোকজন চলাচল কমে গেছে। অজয় আর চলতে পারে না। একটা বড় বাড়ির দরজার সামনে বেশ একটা চওড়া রক দেখতে পেয়ে অজয় সেখানে বসে পড়ে।

গতকাল থেকে একরকম অর্দ্ধাহারে, দুশ্চিন্তায় আর পথশ্রমে তার শরীর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বিছানার বাণ্ডিলটা বালিশের মত করে মাথায় দিয়ে অজয় শুয়ে পড়তেই ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে যেন সে এক নূতন দেশে এসেছে। ওখানে এক রাজপুত্র এসে তাকে ডেকে নিয়ে খেলা করছে। তার মামা তাকে মারতে আসতেই সেই রাজপুত্রের হুকুমে সৈন্যেরা তার মামাকে বেঁধে নিয়ে আসে। হঠাৎ কোথা থেকে অনু এসে কেঁদে বলে "বাবাকে ছেড়ে দিতে বল, নইলে ওরা ওঁকে মেরে ফেলবে।" রাজপুত্র বলে "না একে ছাড়া হবে না। একে আজ শূলে দেওয়া হবে।" মামা এই কথাশুনে রাজপুত্রের হাতে পায়ে পড়তে লাগল। অবশেষে রাজপুত্র বলল "আচ্ছা যাও এবার তোমাকে ছেড়ে দিলাম।"

অজয় ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠতেই দেখে যে অনেক বেলা হয়ে গেছে। সে কোথায় আছে প্রথমটা ভাল বুঝতে পারে না কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয় সব কথা। একজন সৌম্য দর্শন ভদ্রলোক তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অজয় জেগে উঠতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

"তুমি কোথা থেকে এসেছ খোকা ?"

অজয় বলে "কাল সন্ধ্যায় আমি কলকাতা এসেছি, হাঁটতে হাঁটতে এখানটায় একটু বসেছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি

জানতে পারি নাই” এই বলে সে উঠবার চেষ্টা করতেই ভদ্রলোক পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন “তুমি কোথায় যাবে এখন ?”

অজয়। আমার যাবার কোন যায়গা নাই, দেখি যদি কোথাও আশ্রয় পাই।

ভদ্রলোক বললেন—“তোমার নাম কি ?”

অজয়। শ্রীঅজয় কুমার দত্ত।

ভদ্রলোক। তুমি লেখাপড়া জানো ?

অজয়। আমি ক্লাস এইট’এ পড়ছিলাম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন “তোমার বাড়িতে কে আছে ?”

অজয় বলে “আমি মামার বাড়ি থেকে স্কুলে পড়তাম, পরশু বিকালে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম তাই মামা আমাকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।”

ভদ্রলোক। তোমার বাবা মা ?

অজয়। নাই।

ভদ্রলোক বললেন “তুমি আমার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে এস।”

অজয়কে সঙ্গে করে ভদ্রলোক একখানা সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে এসে বলেন “তোমার বিছানাটা ওখানে রেখে এসে বসো।”

অজয় তাঁর কথামত বিছানাটা রেখে এসে একখানা নরম গদি আঁটা লম্বা চেয়ারের মত আসনে বসতেই ভদ্রলোক বললেন, “আমি যদি তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিই তাহলে থাকবে আমার কাছে ?”

অজয় ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় যে সে থাকবে।

ভদ্রলোক তখন একজন চাকরকে ডেকে বলেন "গদাই তোর মাকে একবার ডেকে দেতো?" একটু পরে একজন সুবেশা সুন্দরী মহিলা এসে ঘড়ে ঢুকতেই ভদ্রলোক বলেন "এই নাও গো, তোমাকে একটা ছেলে দিলাম, ওকে ভিতরে নিয়ে যাও, ইলু শীলুর কাছে।"

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটি কার?"

ভদ্রলোক তখন অজয়ের কাছে শোনা তার পরিচয় দিয়ে বললেন "আজ থেকে ও এখানেই থাকবে কেমন?"

মহিলাটি অজয়কে বললেন "এসো খোকা আমার সঙ্গে।"

অজয় বিছানার বাণ্ডিলটা নিতে গেলে তিনি বললেন "ওটা গদাই নিয়ে আসবে, তুমি এসো।"

বড়লোকের বাড়ির ভিতরে অজয় কখনও ঢোকে নাই। ঐশ্বর্য্য কাকে বলে বইতে পড়লেও কখনও চোখে দেখবার সুযোগ হয় নাই তার আগে। এ বাড়ির আসবাবপত্র, রেডিও, অর্গ্যান, ফ্যান্, এসব দেখে তার মনে হতে লাগ'ল যে এ বুঝি তার বইতে পড়া রাজার বাড়ি।

মহিলাটি অজয়কে সঙ্গে নিয়ে একেবারে বাড়ির মধ্যে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "খোকা তোমার আর জামা কাপড় নেই?"

অজয় বলল "পড়নের জামা কাপড় ছাড়া আর যে জামা কাপড় আছে সেগুলো সব কাদায় নষ্ট হয়ে গেছে।"

মহিলা বললেন "আমি তোমায় জামা কাপড় বিকালে কিনে দেব, এখন ঐ বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এসে চা খাবে চল।"

তিনি যে ঘর দেখিয়ে দিলেন সে ঘরটি বন্ধ দেখে অজয় দরজার সামনে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল "ও ঘর বন্ধ রয়েছে যে!"

মহিলা বললেন "না বন্ধ নেই, তুমি খুলতে জানো না তাই, চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে তিনি দরজার কাছে গিয়ে হাতল ধরে একটু ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। দরজা খুলে দিয়ে তিনি বললেন "যাও ভেতরে জল আছে, মুখ হাত ধুয়ে এসো।"

অজয় বাথরুমের ভিতরে ঢুকে দেখে সে এক তাজ্জব ব্যাপার। আয়না, চিরুনি, গন্ধ তেল, সাবান, তোয়ালে, ব্রাস এবং আরও কত কি সাজানো রয়েছে একটা দেয়াল আলমারিতে। কিন্তু জল কোথায়? একটা ওয়াস বেসিনের উপরে দুটো 'পুস্ কক্' একটায় লেখা 'Cold' আর একটায় লেখা 'Hot'। 'Cold' লেখা কক্‌টা টিপতেই জল পড়তে লাগল। অজয় ভাল করে মুখ হাত ধুয়ে কোঁচার কাপড় দিয়েই মুখ মুছে নেয়। পরিচ্ছন্ন তোয়ালে ব্যবহার করতে তার ভয় হয়, পাছে কেউ কিছু বলে।

বাইরে আসতেই মহিলা বললেন "এসো!"

এইবারে অজয় যে ঘরে ঢুকল সেখানা খাবার ঘর। টেবিলের উপরে একখানি সুন্দর ট্রেতে সাজানো টি'পট্, পেয়ালা পিরিচ, 'মিল্কপট্' আর 'সুগার পট্।' তাছাড়া অনেক রকমের কেকও রয়েছে। এসব জিনিস অজয় একবার দেখেছিল তাদের স্কুলে যখন 'এস ডি ও'র ফেয়ারওয়েল পার্টি দেওয়া হয় সেই সময়।

ফ্রক পড়া দুটি সুশ্রী মেয়ে চেয়ারে বসে ছিল। অজয়কে দেখে একজন জিজ্ঞাসা করল "কে মা ?"

অন্যজন জিজ্ঞাসা করল "কবে এসেছে মা ?"

মহিলা বললেন "আজ থেকে এ তোমাদের সঙ্গে থাকবে, এখান থেকেই স্কুলে পড়াশুনা করবে। এর নাম অজয়, তোমরা একে দাদা বলে ডাকবে।"

অজয়কে বললেন "এরা আমার মেয়ে—এইটি ইলা আর এর নাম শীলা। এরা তোমার বোন হবে বুঝলে ?"

লজ্জায় অজয় মুখ তুলে চাইতে পারছিল না ওদের দিকে। ইলা বলল "ওর জামা কাপড় বড্ড অপরিষ্কার না মা ?

মা বললেন "ট্রেনে এসেছে কিনা! বিকালেই ওর ভাল জামা কাপড় আসবে। নাও এইবার তোমরা চা খাও।" তিনি প্রত্যেকের পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে প্লেটে করে কেক সাজিয়ে দিতে দিতে বললেন "লজ্জা করো না খোকা খাও।"

সাত

অজয়কে যে ভদ্রলোক আশ্রয় দিলেন তাঁর নাম সত্যপ্রকাশ চৌধুরী, কিন্তু সবাই তাঁকে মিষ্টার চৌধুরী বলে। হাইকোর্টের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সলিসিটার। ক্রীক রো'তে তাঁর নিজস্ব অট্টালিকা। বাড়িতে পরিবার বলতে মিষ্টার চৌধুরী নিজে, তাঁর স্ত্রী মমতা, আর দুটী মেয়ে ইলা আর শীলা। এ ছাড়া বাড়িতে বাবুর্চি, বয়, সোফেয়ার, গিন্নীর জন্য আলাদা ঝি, একজন চাকর আর একজন মুহুরী থাক'ত।

সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে এসে মিষ্টার চৌধুরী স্ত্রীকে বললেন "ছেলেটির জন্য কিছু কাপড় জামা কিনে নিয়ে আসা যাক কি বল!" সত্যবাবুর স্ত্রীকে সবাই মিসেস্ চৌধুরী বলে। আমরাও এর পর ঐ নামেই তাঁকে অভিহিত করব। মিসেস চৌধুরী অজয় ইলা আর শীলাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে গাড়ী করে মার্কেটিংএ বার হলেন। হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকান থেকে অজয়ের জন্য কয়েকটি স্যুট কিনে ওখান থেকে আবার মিউনিসিপাল মার্কেটে গিয়ে দুই জোড়া শান্তিপুরী ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, সার্ট, একজোড়া সু আর একজোড়া গ্রিসিয়ান স্লিপার, মিসেস চৌধুরীর জন্য একখানা দামী ক্রেপের শাড়ী, আর সংসারের প্রয়োজনে কিছু বিস্কুট, মাখন, জ্যাম,

জেলী এবং আরও কি সব কিনে সন্ধার কিছু আগে বাড়িতে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যার পরে প্রাইভেট টিউটার ওদের পড়াতে এলে মিসেস চৌধুরী তাঁকে বললেন "কাল থেকে এই ছেলেটিকেও পড়াতে হবে, আর ওকে কোনো ভাল স্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে হবে।"

টিউটার অজয়কে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কোন ক্লাসে পড় খোকা?"

অজয়। ক্লাস এইট'এ।

টিউটার। তোমার নাম কি?

অজয়। শ্রীঅজয় কুমার দত্ত।

টিউটার। আচ্ছা বল তো এই কথাগুলো ইংরাজী কোন পদ্যে আছে—

"No nightingle did ever chaunt,
More well come notes to weary bands.... ?

অজয়। "Solitary reaper"

টিউটার। তুমি মুখস্ত বলতে পার এ পদ্যটা?

অজয়। পারি।

টিউটার। বলতো।

অজয় আবৃত্তি করতে লাগল।

"Behold her single in the field
You solitary hiland lass,
Reaping and singing by herself
Stop here or gently pass."

টিউটার। থাক আর বলতে হবে না। আমি কালই তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করতে নিয়ে যাব। তোমার Transfer Certificate আছে তো?

অজয়। না, কিন্তু এখান থেকে লিখলেই হেড্‌মাষ্টার মশাই পাঠিয়ে দিবেন।

টিউটার। এইবার ইলা, দেখি তোমাকে কাল যে translation করতে দিয়ে গিয়েছিলাম সেই খাতাখানা দাও তো।

ইলা খাতাখানা এগিয়ে দিল। টিউটার translationটা দেখে বললেন "একি লিখেছ—

অতি পুরাকালে ভারতবর্ষে বশিষ্ঠ নামে এক ঋষি বাস করিতেন—এর ইংরেজী লিখেছ Many years ago there was a monk named Vasista, ঠিক হয়নি তো?"

ইলা। কেন ঠিক হবে না মাষ্টার মশাই। অতি পুরা-কালে Many years ago, আর ঋষি হচ্ছে Monk.

টিউটার অজয়কে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি বল তো এর ইংরেজী কি হবে?"

অজয়। "In ancient times there lived in India a sage named Vasistha."

টিউটার। ঠিক হয়েছে। শোন ইলা! অতি পুরাকালে Many years ago নয় In ancient times আর ঋষির ইংরেজী Monk নয় Sage। Monk হচ্ছে সন্ন্যাসী।

ওরা পড়াশুনা করছে এই সময় মিষ্টার চৌধুরী ঘরে এসে টিউটারকে জিজ্ঞাসা করলেন "Have you tested the boy ?"

টিউটার। Yes sir, he is a meritorious boy.

মিঃ চৌধুরী। কাল ওকে স্কুলে ভর্ত্তি করবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

টিউটার। মিসেস্ চৌধুরী সে কথা আমাকে বলছেন স্যার।

মিঃ চৌধুরী। All right, আপনি তাহলে পড়ান আমি যাচ্ছি।

টিউটার সেদিনের মত পড়া নিয়ে আর পরের দিনের জন্য task দিয়ে চলে যেতেই অজয় ইলাকে জিজ্ঞাসা করল "তুমি কোন ক্লাসে পড় ?"

ইলা। ক্লাস সেভেন।

অজয়। শীলা কোন ক্লাসে পড় ?

শীলা। আমি ক্লাস ফাইভ।

ইলা। তোমার প্রাইভেট মাষ্টার ছিল না ?

অজয়। না। আমি কত কষ্ট করে পরের বাড়িতে থেকে পড়তাম। প্রাইভেট মাষ্টার তো দূরের কথা মামা আমার ইস্কুলের মাইনেও দিতেন না। আমি হেড্মাষ্টার মশাইকে ধরে ফ্রী ষ্টুডেন্টসীপ জোগার করে নিয়েছিলাম।

শীলা। তুমি তা'হলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ফুটপাতের আলোয় পড়তে বুঝি ?

অজয়। আমাদের ওখানে ফুটপাত কোথায়? পাড়াগাঁ, সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার হয়ে যায়। চারদিকে কুরকুর ক'রে ব্যাঙ ডাকে। লণ্ঠন জ্বেলে কাজ করতে হয় ওখানে।

শীলা। ওরে বাপরে! ব্যাঙ ডাকে? ভয় করে না তোমার?

অজয়। ব্যাঙ ডাকলে ভয় করবে কেন?

ইলা। বইতে পড়েছি সাপে ব্যাঙ খায়, তাহলে ওখানে সাপ আছে?

অজয়। আছে বই কি? কত রকম সাপ, গোখরো সাপ, ডাঁড়াজ সাপ, দুমুখো সাইনী সাপ, ঢোঁড়া সাপ, বোড়া সাপ, ঘরকুনো সাপ!

ইলা। ওরে বাপরে! তুমি সব সাপ দেখেছ?

অজয়। দেখেছি মানে? কত সাপ মেরেছি আমরা।

শীলা। তোমাদের ওখানে আর কি আছে?

অজয়। আর কি থাকবে? বললাম না সে পাড়া গাঁ। সেখানে আছে ধানের ক্ষেত। আম কাঁঠাল সুপারি নারকেলের বাগান, বড় বড় জলা, জলার মধ্যে ফুটে থাকে পদ্মফুল, সাদা সাদা বকগুলো জলার ধারে বসে লম্বা ঠোঁট দিয়ে মাছ ধরে ধরে খায়।

ইলা। খুব মজা তো? তুমি দেখতে পাও এ সব?

অজয়। আমি কেন, সবাই দেখতে পায়। ওখানে বর্ষাকালে নদীর জলে মাঠ ঘাট সব জলে ডুবে যায়। আমরা নৌকায় চড়ে বেড়াই তখন।

ইলা। আমরাও নৌকায় চড়েছি—একবার দক্ষিণেশ্বর গিয়ে—মনে আছে শীলা ?

শীলা। মনে নেই আবার ? আমার সে কি ভয় বাবা ! নৌকায় আবার কেউ চড়ে নাকি ?

ইলা। ঐ যে তুমি বললে না সেখানে ধানের ক্ষেত আছে ? ধানের গাছ কত বড় হয় এক একটা ?

অজয়। ধান গাছ দেখ নাই বুঝি, সে খুব ছোট্ট, আবার কোন কোন ধান, যেগুলো বর্ষাকালে হয় সেগুলো সাত আট হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

শীলা। ধান গাছে ডাল হয় না ?

ইলা। দুর্ বোকা, ধান গাছে ডাল হবে কি রে ? ছবি দেখিস নি ? ও গুলো যে আকের মত।

অজয় হেসে বলে "তুমিও ঠিক বলতে পারলে না, ওগুলো লম্বা ঘাসের মত অনেকটা।"

এইসব কথাবার্তা হতে হতে চাকর এসে খবর দিল "দিদিমনি চলুন আপনারা, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

আট

শশিকান্তর সংসারে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে ধনসম্পত্তির লোভ শশিকান্তর এত বেশী যে তার জন্য সে তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তানদেরও অপাত্রে দান করতে কুণ্ঠিত ছিল না। শশিকান্তর আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থা বেশ ভালই। ছলে কৌশলে অধমর্ণদের শোষণ করে নামমাত্র মূল্যে জমি লিখিয়ে নিয়ে এবং সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করে তার যা আয় হ'ত তা একজন ছোটখাট জমিদারের আয়ের চাইতে কম ছিল না। উপরন্তু জমিদারির জন্য আমলা গোমস্তা, পূজা পার্বণ, জমিদারি চালচলনের ব্যয় ইত্যাদি না থাকায় শশিকান্তর আয় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় ইচ্ছা করলে নিজের কন্যা দুটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দেওয়া তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু টাকা জমাবার অহেতুক আগ্রহ যেমন তার ছিল ততোধিক ছিল তার ব্যয়কুণ্ঠা। কৃপণদের মধ্যে যদি কৌলীন্য থাকত তা'হলে শশিকান্ত হ'ত নৈকষ্য কুলীন। পূর্বেই বলেছি যে শশিকান্ত টাকা খরচের ভয়ে তার বড় মেয়ের বিয়ে এক পাগল ছেলের সঙ্গে দিয়েছিল। ভাল শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হ'লে টাকা খরচ হয় তাই সে যখন এই পাগল ছেলের সন্ধান পায় ঘটকের কাছে এবং যখন শোনে যে ওখানে এক পয়সাও ব্যয় করতে তো

হবেই না এমন কি বিবাহের ব্যয় বাবদ টাকাটাও বরপক্ষই দেবে তখন সে সানন্দে মত দেয় এই বিবাহে। ছেলের সম্বন্ধে ঘটক বলেছিল যে "লোকে একটু মাথা খারাপ বললেও আসলে ও সব কিছু নয়, একটু মাথা গরম—তা সময়ে ঠিক সেরে যাবে।"

শশিকান্তর কোন ছেলে ছিল না। তার যা কিছু সম্পত্তি, টাকাকড়ি সব কিছুই তো তার ঐ দুটি মেয়েই পাবে, এ জেনেও সে টাকা ব্যয় করতে চাইত না। এমনকি সংসারের খাওয়া পড়ার ব্যাপারেও শশিকান্ত নিতান্ত জীবন ধারণ করতে আর লজ্জা নিবারণ করতে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী এক পয়সাও ব্যয় করত না।

এর ফলেই তার বড়মেয়ে নিরুপমা সধবা হয়েও বিধবার মত এসে আবার তারই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তবুও তার চৈতন্য হয় নাই। ছোট মেয়ের বিয়েতে শশিকান্ত আরও এককাঠি উপরে উঠেছে। ছোট মেয়ে অনুপমাকে শশিকান্ত তার চেয়েও বেশী বয়সের এক বৃদ্ধ জমিদারের সাথে বিয়ে দেবে ঠিক করেছে।

এই বৃদ্ধ জমিদারের নাম রমাপ্রসাদ নাগ। বয়স বোধ হয় পঞ্চান্নরও বেশী। দন্তহীন, পলিতকেশ এই বৃদ্ধের এইবার নিয়ে চতুর্থবার দারপরিগ্রহ করা হ'ল। ভদ্রলোকের প্রথমা পত্নী সুশীলা সুন্দরী তাঁর একচল্লিশ বৎসর বয়সে গতাসু হয়। বছর না ঘুরতেই দ্বিতীয়া কাদম্বিনী আসে। সেও তিন

বৎসর পার না হতেই মারা যায়, তারপর আসে মাধবী কিন্তু ভদ্রলোকের বরাতে মাধবীও টেকে না। মাধবী যখন গত হয় ভদ্রলোক তখন বেশ বৃদ্ধ, কিন্তু তিন তিনবার দার-পরিগ্রহ করেও কোন সন্তানাদি না হওয়ায় এবং বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহাতিশয্যে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও (?) চতুর্থবার বিবাহ করতে সম্মতি না দিয়ে পারেন না।

জমিদার হিসাবে রমাপ্রসাদ বাবুর নামডাক ছিল তাই ঘটক যখন এই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে শশিকান্তর কাছে এল তখন সে প্রথমটা একটু আপত্তি করলেও বিবাহের যাবতীয় ব্যয় বাবদ পাঁচহাজার আর নগদে এক হাজার টাকা পাবে শুনে সহজেই সম্মতি দিল।

এদিকে রমাপ্রসাদ কলকাতা গিয়ে ধর্মতলার এক নামকরা ডেন্টিস্টের দোকান থেকে দাঁত বাঁধালেন, কলুটোলা থেকে হেয়ারডাই কিনলেন, জহরলাল পান্নালালের দোকান থেকে বেনারসী শাড়ি আর নিজের জামা কাপড় আর বি সরকারের দোকান থেকে নব-বধূর জন্য গয়না এবং আরও অনেক যায়গা ঘুরে অনেক কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরলেন। বাঁধানো দাঁত তাঁর তোবড়ানো গাল সমান করে দিল, কলপ দিল চুলগুলিকে কালো করে।

এরপর একদিন সন্ধ্যাবেলা শাঁক বাজলো। বাজনাদাররা বাজনা বাজালো, মেয়েরা উলু দিল, নিমন্ত্রিতরা ভূরিভোজন করল, পুরোহিত মন্ত্র পড়াল এবং শুভলগ্নে শ্রীমান রমাপ্রসাদ

নাগের সহিত কল্যাণীয়া শ্রীমতী অনুপমার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

শশিকান্ত এখন আর সুধু সুদখোর মহাজন নয় এখন সে ও তল্লাটের ডাকসাইটে জমিদার রমাপ্রসাদ নাগের শ্বশুর।

অনুপমা—বাংলার পল্লীগ্রামের সুন্দরী তরুণী—ওরও যে জীবনে কোন আশা বা আকাঙ্খা থাকতে পারে—যৌবনারম্ভে বিবাহের প্রথম মিলনের ক্ষণে—ওর মনের লুকিয়ে থাকা আশা—সুন্দর স্বাস্থ্যবান যৌবনোদৃপ্ত বলিষ্ঠ পুরুষের সাহচর্য্য—সব কিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেল একটা আঘাতে। বাধা দিবার অধিকার নাই, বিবাহের পূর্বে ভাবী স্বামীকে যাচাই করে দেখবার সুযোগ নাই। সে পাগল হোক, বৃদ্ধ হোক, বিকলাঙ্গ হোক আর কুৎসিত যৌনব্যাধিগ্রস্ত যাই হোক না কেন পল্লীগ্রামের—আর সুধু পল্লীগ্রাম কেন বাংলার বেশীরভাগ মেয়েকেই, বাপ বা অভিভাবক যার সাথেই বিয়ে দিক সে বিয়ে তাকে করতেই হবে।

স্বামীর বাড়িতে এসেই অনুপমা জানতে পারে যে তার স্বামীর বয়স তার বাবার চাইতেও বেশী। এ অবস্থায় পতিভক্তি বা স্বামীর সঙ্গে প্রেম যদি তার না হয় তাহলে তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে কি?

অনুপমার দাম্পত্য জীবন অচিরেই বিষবৎ হয়ে উঠল। সে সব সময়ই চেষ্টা করত রমাপ্রসাদকে পরিহার করে চলতে, কিন্তু হিন্দু সমাজে তার দেহের উপরে সর্বপ্রকার

অধিকার যখন এই বৃদ্ধের রয়েছে তখন তাকে বাধ্য হয়েই বৃদ্ধের অক্ষম কাম-লালসার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হ'ত। অনুপমা ভাবত যে এর চেয়ে তার বিধবা হওয়াও ভাল।

বাপের উপরে তার অভিমান ক্রমে ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে গেল। শশিকান্ত কখনও তার সাথে দেখা করতে এলে অনুপমা ভাল করে কথা বলত না তার সঙ্গে। সামান্য দুএক কথায় সে বাবাকে বিদায় করে দিত। শশিকান্ত ভাবত যে মেয়ে এখন জমিদার বাড়ির গিন্নী হয়েছে কিনা তাই আর দেমাকে মাটিতে পা পড়তে চায় না।

এইভাবে তিনটি বৎসর পার হতেই রমাপ্রসাদবাবু একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনুপমা বিষয়ী শশিকান্তর মেয়ে হওয়ায় একটা ব্যাপারে তার বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। সে জানত যে তার গর্ভে কোন সন্তান না হ'লে স্বামীর অবর্তমানে সে কেবল জমিদারির জীবনস্বত্ত্ব মালিক হবে। দান বিক্রির কোন অধিকার তার থাকবে না, আর এ'কথাও জানতে তার দেরি হ'ল না যে তার কোন সন্তান হওয়াও বৈধ ভাবে সম্ভব নয়, তাই সে স্বামীকে দিয়ে জমিদারি নিজের নামে দানপত্র লিখিয়ে নিয়ে রেজিষ্টারী করিয়ে নিয়েছিল। তরুণী ভার্য্যার আবদারে বৃদ্ধ জমিদারও আপত্তি করবার কিছু ছিল না দেখেই হোক আর অনুপমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই হোক এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই।

রমাপ্রসাদবাবুর অসুখ ক্রমেই বেড়ে চলল। ডাক্তার এসে দেখে বলল "জ্বরটা রেমিট্যাণ্ট টাইপের—টাইফয়েড হওয়া সম্ভব।" চিকিৎসার কোন ক্রটী হ'ল না। অনুপমা স্বামীকে ভালবাসুক আর নাই বাসুক তাঁর অসুখের মধ্যে সে যথাসাধ্য করতে লাগল। আগে প্রত্যেকবারেই তাঁর স্ত্রীরা মারা গেলেও এবার কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল। রমাপ্রসাদবাবু প্রায় দুই সপ্তাহ অসুখে ভুগে তরুণী পত্নীকে বিধবা করে পরলোকের পথে যাত্রা করলেন।

অনুপমা কাঁদল। তার কান্নার মধ্যে কিন্তু কোন কৃত্রিমতা ছিল না। খবর পেয়ে শশিকান্ত এসে মেয়েকে শোকে শান্তনা দিতে চেষ্টা করতে লাগল। মহাসমারোহে জমিদার রমা-প্রসাদের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন হয়ে গেল। গরীব দুঃখীরা শীতের দিনে খাবার পরেও প্রত্যেকে একখানা করে কম্বল আর চার আনার পয়সা দান পেয়ে দুহাত তুলে অনুপমাকে আশীর্বাদ করল। বামুনরা বলাবলি করল "হ্যাঁ খাইয়েছে বটে! এরকম খাবার পরেও আবার একখানা করে ধুতি আর একটাকা করে দক্ষিণা! এমন দরাজ হাত ক'টা বড়লোকের আছে আজকাল? মা যেন আমাদের সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। গ্রামের লোকেরা বলল—হাঁ, বহুদিন পরে গ্রামে আবার একটা শ্রাদ্ধের মত শ্রাদ্ধ হ'ল বটে! অনুপমা সবাইকে সন্তুষ্ট করল।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে একদিন শশিকান্ত মেয়ের কাছে বসে বলতে আরম্ভ করল—"মা তোমার বিপদও যা আর

আমার বিপদও তাই, আজ তোমার এই বিপদের সময় আমি যদি এসে বুক পেতে না দাঁড়াই তাহলে তোমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে সাতভূতে সব লুটেপুটে খাবে, হাজার হলেও জমিদারি তো এখন তোমারই।"

অনুপমা বলল "তোমাকে আর কষ্ট করে কিছু দেখতে হবে না বাবা, ও আমি নিজেই পারব।"

শশিকান্ত। পারব বললেই তো আর হবে না, এর নাম জমিদারি! জমিদারি চালানো কি মেয়েছেলের কর্ম—হ্যাঁ তবে বলতে পার বটে যে রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, জাহ্নবী চৌধুরাণী এঁরা কি জমিদারি চালান নাই? তা চালিয়েছেন স্বীকার করি, তবে কি জান মা—ওঁরা তো ঠিক মানুষ ছিলেন না, ওঁদের উপরে ছিল দেবতার দয়া। কিন্তু এইসব জটিল বৈষয়িক ব্যাপার—তোমার পক্ষে তো দেখাশুনা করা একেবারেই সম্ভব হবে না মা!

অনুপমা। কিন্তু আমি তো তোমাকে ডাকিনি বাবা। আমার জিনিস আমি নিজে যদি রাখতে না পারি—না হয় যাবে নষ্ট হয়ে! তবুও তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাই না।

শশিকান্ত। কষ্ট আর কি! তা ছাড়া এতো আমার কর্ত্তব্যই এক রকম!

অনুপমা। কর্ত্তব্যের কথাই যদি বললে বাবা, তাহলে বলি—আজ আমার জমিদারি রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য

হয়ে পড়েছে কিন্তু যেদিন চৌদ্দ বৎসর বয়সে ষাট বছরের এক বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলে সেদিন তোমার কর্ত্তব্য কোথায় ছিল? আর বিয়ে দিয়েছিলেই বা বলি কি করে, তুমি তো কশাইখানায় গরু বিক্রি করবার মত হাজার টাকা দাম নিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিলে।

শশিকান্ত উত্তেজিত হয়ে বলে—"তুই কি আমাকে অপমান করতে চাস্?"

অনুপমা। মান অপমানের কথা ওঠে না, তুমি যা করেছ তাই বলছি। তোমার টাকার অভাব ছিল না কোনদিনই, কিন্তু ছেলেবেলায় তুমি একখানা ভাল শাড়িও আমাকে কিনে দাও নি। টাকা খরচ হবে এই ভয়ে দিদিকেও তুমি ঠিক আমারই মত বিক্রি করেছিলে এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে—তুমি টাকা নাওনি তার বাবার কাছে? অজয়দার সব সম্পত্তি তুমি গ্রাস করেও তাঁর সঙ্গে কখনও চাকরবাকরের চাইতে ভাল ব্যবহার কর নি। শেষ পর্য্যন্ত তুমি তাকে অকারণে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ, এ সবের বেলায় তোমার কর্ত্তব্য কোথায় ছিল? যাক! কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তুমি বাড়ি যাও, মা'র নাকি শুনছি কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে, কখনও তো ভাল করে খেতে পড়তে দাও নি মাকে! যাও ভাল করে তাঁর চিকিৎসা করাওগে। আমাকে সাহায্য করবার লোকের অভাব হবে না।

মেয়ের এইরকম স্পর্ধার কথা শুনে শশিকান্ত জ্বলে উঠে বলল, "কি! দুটো পয়সার মুখ দেখে তুই আর লঘুগুরু মানিস্ না! আমার ঔরসজাত মেয়ে হয়ে তুই আমাকেই অপমান করতে সাহস করিস—বেশ ভাল, আমি চলেই যাচ্ছি! তবে একটা কথা শুনে রাখ্—কোন সময় দরকার হলে আমার পায়ে পড়লেও কোন সাহায্য তুই পাবি না আমার কাছে।" রাগে গড়গড় করতে করতে শশিকান্ত বার হয়ে যায়।

নয়

অনুপমা তার বাবাকে ঠিকই বলেছিল যে, এখন তার সাহায্য করবার লোকের অভাব হবে না। এস্টেটের ম্যানেজার এখন কারণে অকারণে প্রায়ই এসে তার সঙ্গে দেখা করতে লাগল। এই ম্যানেজার লোকটির বহু গুণের কথা অনুপমা তার স্বামীর কাছে আগেই শুনেছিল। প্রজার উপরে অত্যাচার করতে এর জুড়ি পাওয়া ভার। তাছাড়া কারণে অকারণে এর-ওর সঙ্গে মামলা বাধিয়ে দেওয়াও ছিল এই ম্যানেজারের আর একটি গুণ।

একদিন ম্যানেজার এসে কথায় কথায় অনুযোগ দিয়ে বলল, "মা, আপনি হাজার হলেও ছেলে মানুষ। বয়সে আমার ছোট মেয়েও আপনার চাইতে বড় হবে, তাই বলছিলাম কি যে,-জমিদারি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে আপনি আমাকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি যদি সব সময় অধীনস্থ কর্মচারীদের ডেকে কাজকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহলে ওরা আমাকে মানবে কেন?"

অনুপমা। কিন্তু কর্মচারীরা কি করছে না করছে এ বিষয়ে আপনার যেমন এস্টেটের প্রধান কর্মচারী হিসাবে দেখাশুনা করবার দায়িত্ব রয়েছে সেই রকম জমিদারির মালিক হিসাবে আমারও জানা দরকার নয় কি যে, কোন কর্মচারী

উপযুক্ত আর সৎ আর কে অসৎ বা অনুপযুক্ত? ওদের যদি কখনও কোন কাজের গাফিলতি লক্ষ্য করেন, আপনি তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন, আমি তার যথাবিহিত ব্যবস্থা করব। আর একটা কথা! যদিও আপনি আমার বাবার বয়সী—পিতৃস্থানীয়, কিন্তু কাউকে কোন শাস্তি দিতে হলে, তা সে কর্মচারীই হোক আর কোন প্রজাই হোক, আমাকে না জানিয়ে দিবেন না, এই আমার আপনার কাছে অনুরোধ।

ম্যানেজার অনুপমার এই কথা শুনে মনে মনে বুঝতে পারল যে, এই মেয়েটিকে সে যতটা সহজ ও সরল ভেবেছিল আসলে মোটেই তা নয়। সে যে এই জমিদারির মালিক এ কথা সে খুব ভাল করেই জানে। ম্যানেজার এরপর আর বেশী কথা না বলে "আচ্ছা মা তাই হবে" বলেই সেদিন বিদায় নিল।

অনুপমা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছিল যে, ম্যানেজার এই এস্টেটে চাকরি করে যে-সম্পত্তি করেছে তার আয় একটা ছোটখাট জমিদারির আয়েরই মত।

এর কিছুকাল পরেই চর দখল নিয়ে এক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় অন্য এক জমিদারের পাইকদের সঙ্গে অনুপমার পাইক ও লাঠিয়ালদের। চর দখল হয় বটে কিন্তু অন্য পক্ষের গোটা তিনেক লোক খুন হয় এই দাঙ্গায়। অন্য জমিদারের তরফ থেকে তখন দাঙ্গা আর খুনের মামলা আনা হয় অনুপমার তরফের কয়েকজন পাইক, লাঠিয়াল আর এক ডিহির

নায়েবকে আসামী করে। অনুপমার তরফ থেকেও পাল্টা এজাহারে ঠিক একইভাবে খুন আর দাঙ্গার মামলা আনা হয় ওদের তরফের কয়েকজনের নামে।

ঘটনাটা অনুপমা জানত না। সেদিন হঠাৎ থানা থেকে দারোগা 'এনকোয়ারী' করতে কাছারিতে এলে একজন চাকর এসে অনুপমাকে জানায় যে, "দারোগা বাবু এসেছেন খুনের তদন্ত করতে।"

অনুপমা আশ্চর্য্য হয়ে বলে "খুনের তদন্ত! আমার কাছারিতে! তুই একবার ম্যানেজার বাবুকে ডেকে দে—বল রাণীমা এখনই ডাকছেন।"

হঠাৎ অনুপমার তলব পেয়ে ম্যানেজার দারোগা বাবুকে বসিয়ে রেখে এসে বলল—"আমাকে ডেকেছেন মা ?"

অনুপমা। হাঁ। দারোগা কেন এসেছে এখানে ?

ম্যানেজার। ও কিছু নয় মা, এসব বৈষয়িক ব্যাপার—জমিদারি চালাতে হলে কত রকম যে ঝক্কি পোয়াতে হয় তার কি কোন ঠিক আছে ? এই তো দেখুন না—নদীতে নূতন চর জেগেছে, ওটা আমাদেরই পয়োস্তি সম্পত্তি। হঠাৎ খবর পেলাম একদিন মফঃস্বলে গিয়ে যে, রামনগরের জমিদার নাকি জোর করে আমাদের অধিকারভুক্ত ঐ চর দখল করবার জন্য লাঠিয়াল পাঠাচ্ছে। এখবর শুনে তো আর আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আগে থাকতেই আমাদের লোকজন ওখানে মোতায়েন রাখি। তারপর একদিন ওদের লাঠিয়ালরা এসে

আমাদের লোকদের উপরে আক্রমণ চালায়। তাতে ঐ কিছুটা মারামারি হয়েছে, ওরা বলছে যে ওদের নাকি তিনজন খুন হয়েছে! সব মিথ্যা কথা মা। ওরা তো কোন লাশ পায় নি। এ মিথ্যা মামলায় ওরা নিশ্চয় হেরে যাবে এ আপনি দেখে নেবেন। আচ্ছা আমি তা হলে এখন চলি মা! ওদিকে দারোগা বাবু বসে আছেন, একটা রিপোর্ট লিখিয়ে দিতে হবে তো? দুর্গা শ্রীহরি! দুর্গা শ্রীহরি!

ম্যানেজার চলে যাচ্ছে দেখে অনুপমা বলল—"যাবেন না, শুনুন!"

ম্যানেজার যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলল, "ওদিকে যে মা দারোগা বাবু বসে রয়েছেন! কথাটা কি একটু পরে—আমি বলি কি, দারোগা বাবু চলে যাবার পরেই বলা চলে না মা?"

অনুপমা। না, কথাটা এখনই আপনার জানা দরকার। আমি না আপনাকে বলেছিলাম যে কাউকে কোন শাস্তি দিতে হলে আমাকে না জানিয়ে দেবেন না।

ম্যানেজার। তা এখানে কাউকে শাস্তি দেবার কোন প্রশ্ন তো ওঠে না মা, আর যদি শাস্তির কথাই বলেন তাহলে যারা শাস্তি পেয়েছে তারা তো আমাদের প্রজাও নয় বা কর্মচারীও নয়।

অনুপমা ব্যথিত এবং উত্তেজিত হয়ে বলে......"কিন্তু এ জমিদারির মালিক কি আমি না আপনি?"

ম্যানেজার। কেন এ কথা মা! আমি এ এস্টেটের একজন সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র।

অনুপমা। আচ্ছা আপনি যান। এই দাঙ্গাহাঙ্গামার সব কিছু বিবরণ আমি আজই জানতে চাই আপনার কাছে—বুঝেছেন ?

ম্যানেজার। এ সব ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই ভাল করতেন মা! তবে আপনার যেমন অভিরুচি, আজই রিপোর্ট পাবেন।

* * *

এই ব্যাপারের কিছুদিন পরেই অনুপমা খবর পেল যে পুলিশ থেকে প্রাথমিক রিপোর্ট গেছে যে, এই খুনের ব্যাপারে তার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ উসকানি আছে বলে মনে হচ্ছে, পরবর্তী তদন্তে আরও বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে।

সদর নায়েব এসে একদিন গোপনে বলে গেল "মা, আপনি ম্যানেজার বাবুকে চটাবেন না, বিপদ হতে পারে।"

এরপর ঘটনার পরিণতি আরও গুরুতর হয়ে উঠল। অনুপমার পক্ষের যাদের আসামী করা হয়েছিল তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে নিয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন নাকি একরার করেছে যে, জমিদারির মালিক রাণীমা-ই ডেকে

নিয়ে ওদের হুকুম দিয়েছিলেন যে, "যত খুন হয় হোক, চর দখল করতেই হবে।" তাই তো তারা চরে অন্য জমিদারের প্রজারা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও গিয়ে আক্রমণ করেছিল।

অনুপমা বুঝতে পারল যে, এসবই ম্যানেজারের কারসাজি। কিন্তু বুঝেও তার কিছু করবার উপায় নাই। অনুপমার এখন সব সময় চিন্তা কি করে এই ম্যানেজারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। একবার ভাবল ম্যানেজারকে বরখাস্ত করবে, আবার ভাবল যে তাহলে সে সোজা শত্রুতা আরম্ভ করবে। মহলে মহলে যত কর্মচারী সবাই ম্যানেজারের হাতের লোক। ও যদি খাজনা বন্ধ করতে পরামর্শ দেয় প্রজাদের, আর আমলারা যদি ওর সহযোগিতা করে তাহলে মহা বিপদ হবে।

এই সব নানা কথা ভেবে অনুপমার একবার মনে হয় তার বাবাকে খবর দিয়ে আনবার কথা কিন্তু তার বাবার সেদিনের সেই কথা "কোন সময় দরকার হলে আমার পায়ে পড়লেও কোন সাহায্য তুই পাবি না" মনে পড়তেই সে ভাবে যে, "নাঃ আমার যত বিপদই হোক বাবাকে কিছুতেই ডাকব না।" অনুপমা তখন এক কাজ করে বসল। সে চিঠি দিয়ে লোক পাঠাল রামনগরের জমিদারের কাছে। চিঠিতে লিখল যে, "সে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। সে স্ত্রীলোক না হলে নিজেই তাঁর কাছে যেত। যদি তিনি দয়া করে এসে দেখা করেন তাহলে বিশেষ অনুগৃহীতা হবে।"

অনুপমার চিঠি পেয়ে রামনগরের জমিদার হরিপ্রসন্ন দেব প্রথমে এটাকে একটা জমিদারি চাল মনে করে যে লোকটি চিঠি নিয়ে এসেছিল তাকে বলল, "আচ্ছা তুই যা আমি পরে উত্তর দেব।" পরে চিন্তা করে দেখল যে, যদি যাওয়াই যায় তাহলেই বা এমন কি বিপদ হতে পারে! ওরা তো তাকে আর গুম খুন করতে সাহস পাবে না। তবুও সাবধানের মার নাই মনে করে হরিপ্রসন্ন একজন স্ত্রীলোককে প্রথমে একখানা চিঠি দিয়ে অনুপমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দিল।

চিঠিতে সে লিখল, "আপনার আমন্ত্রণ লিপি পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে, বিশেষতঃ বর্তমানে কতকগুলো মামলা মোকর্দমার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আপনার বাড়িতে একা যাওয়া বিপজ্জনক হইতে পারে। এই সব বিবেচনায় আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, কি জন্য আমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সে বিষয়ে যদি একটু আভাষ দিতেন তাহা হইলে দেখা করা না করার বিষয় বিবেচনা করা যাইত। অবশ্য ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না কারণ এই সাক্ষাৎ কোন সামাজিক সাক্ষাৎকার হইলে আমি অতি আনন্দের সহিত দেখা করিতাম।"

হরিপ্রসন্নর এই চিঠি পেয়ে অনুপমা যে স্ত্রীলোকটি চিঠি নিয়ে এসেছিল তার হাতেই উত্তর লিখে পাঠাল; "আপনার পত্র পাঠ করিলাম। আপনি যে সন্দেহ করিয়াছেন উহা

অমূলক। যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে উহা আমার মত বা ইচ্ছানুসারে হয় নাই। আমার চারদিকে চক্রান্ত জাল পাতা হইতেছে। কোন রকম বিবাদ বিসংবাদ করা আমার কখনও ইচ্ছা নয়। এই কারণেই আমি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছি। আশা করি আপনি যথাশীঘ্র আমার সঙ্গে একবার দেখা করিবেন।”

হরিপ্রসন্ন এই চিঠি পেয়ে অনুপমার সঙ্গে দেখা করাই স্থির করল। দুইদিন পরেই সকালে পালকি করে জমিদার হরিপ্রসন্নদেব অনুপমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হ'ল। অনুপমাকে সংবাদ দেওয়া হ'লে সে হরিপ্রসন্ন বাবুকে যথোচিত সমাদরে দোতলার বৈঠকখানা ঘরে এনে বসাতে আদেশ দিল।

হরিপ্রসন্নবাবু এসে বৈঠকখানায় বসলে পাশেই এক চিকের আড়ালে বসে অনুপমা হরিপ্রসন্ন বাবুকে বলল, “আপনি এসেছেন দেখে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বর্তমানে এই জমিদারির মালিক আমি। কিন্তু নামে আমি মালিক হলেও দেখছি আমার আদেশ মত কোন কাজই এখানে হয় না। আপনাদের সঙ্গে চর নিয়ে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে সে খবরও আমি আগে জানতে পারি নাই। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। কিন্তু আমার আদেশ ছিল যে কারো সঙ্গে যেন কোনরকম বিবাদ বিসংবাদ না করা হয়। এই আদেশের কথা মনে করিয়ে দিতে গিয়ে এখন দেখছি যে মামলায়

আমাকেই জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে—অবশ্য আমার লোকেরাই তা করছে। এইসব দেখেশুনে জমিদারিতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।”

হরিপ্রসন্ন। তা আমাকে এ বিষয়ে কি করতে বলছেন?

অনুপমা। আপনাকে আমি কিছুই করতে বলছি না। আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম এই জন্য যে আমি এ জমিদারি বিক্রি করে দিতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার এ জমিদারির আয় কত? আপনি যদি এই জমিদারি কিনে নিতে চান তাহলে আমি এ সব বিষয় সম্পত্তির দায় থেকে রেহাই পেতে পারি, কারণ আমি বুঝতে পারছি যে জমিদারি চালানো আমার কাজ নয়।

হরিপ্রসন্ন। আপনি ভাল করে ভেবে এ কথা বলছেন তো?

অনুপমা। নিশ্চয়ই! আমি যদি আজ পারি ত' আজই এ জঞ্জাল পরিত্যাগ করি।

হরিপ্রসন্ন। জমিদারি বিক্রি করলে কি রকম মূল্য আপনি আশা করেন?

অনুপমা। আমি জমিদারি, এই বসতবাড়ি, এখানকার আসবাবপত্র সব কিছুই বিক্রি করে দিতে চাই। আপনিই বলুন—কি টাকায় হ'লে আপনি নিতে পারেন?

হরিপ্রসন্ন। আপনাদের কাগজপত্র তো আমি দেখি নাই, তবে না দেখেও আমি আপনাকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে পারি।

অনুপমা। তাহলে আপনি সব ব্যবস্থা করুন, আমি রাজী।

হরিপ্রসন্ন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—বলবেন কি ?

অনুপমা। বলুন ?

হরিপ্রসন্ন। একটু আগে আপনি বলছিলেন যে আপনার কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার বিরুদ্ধাচরণ করছে, কে এই কর্ম্মচারী জানতে পারি কি ?

অনুপমা একটু চুপ করে থেকে বলল—"ইনি আমাদের ম্যানেজার নবকুমার ঘোষাল মশাই।"

হরিপ্রসন্ন। বুঝতে পেরেছি মা! জমিদারি আপনি কি জন্য বিক্রি করতে চাইছেন আমি তার কিছুটা অনুমান করতে পেরেছি। আপনি কি নগদ টাকা নিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চান ?

অনুপমা। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

হরিপ্রসন্ন। আচ্ছা তাহলে আজই আমি আমাদের এটর্ণি অফিসে চিঠি লিখে দিচ্ছি, আপনাদের এটর্ণিকেও আমি চিনি, আশা করি আপনি ইতিমধ্যে মত না বদলালে এক মাসের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আমি তাহলে এখন উঠি মা ?

অনুপমা। আপনি বসুন। আমি আপনার জলখাবার ব্যবস্থা করেছি, একটু মিষ্টি মুখ করে যেতেই হবে।

হরিপ্রসন্ন। কিন্তু আমি তো কোথাও আহার করি না মা।

অনুপমা। আমি আপনার মেয়ের বয়সী, নিজের মেয়ে হলে কি তার বাড়িতে আপনি না খেয়ে ফিরতে পারতেন ?

হরিপ্রসন্ন। আমি আপনার কাছে হার স্বীকার করছি মা। এরপর আর আমার কোন কথা বলা চলে না।

* * *

এক মাসের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। একদিন খবর পাওয়া গেল যে প্রমাণ অভাবে পুলিশ ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়েছে খুন আর দাঙ্গার মামলার। দলিন পত্র লেখা, সইসাবুদ ইত্যাদি যা কিছু করা দরকার দুই তরফের এটর্ণি মারফত সে কাজে মোটেই বিলম্ব হ'ল না। মাসখানেক পরে একদিন অনুপমার তরফের এটর্ণি জানালেন যে তার নামে পাঁচ লাখ টাকা জমা দিয়েছে রামনগরের জমিদার। টাকাটা কি করা হবে এটর্ণি তাও জানতে চাইলেন।

কাগজেপত্রে জমিদারি হস্তান্তরিত হবার পরে একদিন হরিপ্রসন্ন বাবু এসে জমিদারির দখল নিল। ম্যানেজার নবকুমারকে জমিদারি দখল নেবার দিনেই সে বরখাস্ত করল, বলল যে "আমার এস্টেটে একজন ম্যানেজার যখন রয়েছে তখন আপনাকে আর আমার দরকার হবে না।" অন্যান্য আমলা গোমস্তাদেরও ডেকে সে জানাল যে "আপনারা যদি কেউ কাজ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করেন তাহলে এখনই যেতে পারেন। আমার তাতে কোন আপত্তি নাই।"

ম্যানেজার নবকুমার বুঝল যে একটা মেয়ের কাছে

সে আজ হেরে গেল, কিন্তু তার আর কিছু তখন করবার ছিল না।

অনুপমা হরিপ্রসন্ন বাবুকে প্রণাম করে বাড়ির ঝি কুমুদিনী আর চাকর হরিপদকে সঙ্গে করে কলকাতা চলে গেল। বলতে ভুলে গেছি, এটর্ণি অফিসের সহায়তায় অনুপমা বালীগঞ্জ অঞ্চলে একখানা ছোট দোতলা বাড়ি কিনে সেই বাড়িতেই থাকবে বলে অগেই ঠিক করে রেখেছিল।

———

দশ

বহুদিন অজয়ের খবর নেওয়া হয় নাই। মিষ্টার চৌধুরীর বড় মেয়ে ইলার বিয়ে হয়ে গেছে। ইলার স্বামী অনিলবরণ শ্বশুরের টাকায় ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেতে গিয়ে ক্যামেরার কাজ শিখে এসেছে। বিলেতে থাকতে শ্বশুরের টাকার কি ভাবে সদ্ব্যবহার করতে হয় তা সে করে দেখিয়েছে। জার্মানীর 'উফা' ষ্টুডিওতে সে নাকি হাতে কলমে কাজ শিখবার সুযোগ পেয়েছিল—সে বলে যে ঐ সুযোগ পাওনা নাকি এক দুর্লভ ব্যাপার। হলিউডে যাবার ইচ্ছাও তার ছিল—ওখানে প্যারামাউণ্ট, কলম্বিয়া আর মেট্রোগোল্ডউইন ষ্টুডিওতে "প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার" করতে—কিন্তু মিষ্টার চৌধুরী আর টাকা খরচ করতে রাজী না হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ফিরে আসতে হয় 'ইণ্ডিয়ায়।'

বর্তমানে অনিলবরণ কলকাতার কোন এক ষ্টুডিয়োর ক্যামেরাম্যান। ক্যামাক ষ্ট্রীটে 'রুমস্' নিয়ে আছে সে।

অজয় এখন কলেজে পড়ে, এবার বি, এ, দেবে। শীলা আই, এ, পড়ছে। মিষ্টার চৌধুরী এখন আর আগের মত নাই। বছর দুই আগে থেকে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলেছে। এখন প্রায় প্রত্যহই গভীর রাত্রে মাতাল অবস্থায় তনি বাড়িতে আসেন। মিসেস চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলে বলেন

"এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল," বা "একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়েছিলাম," আবার কখনও বা রেগে উঠে বলেন "কোথায় থাকি না থাকি সে কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে নাকি ?"

মিষ্টার চৌধুরীর অধঃপতন আরম্ভ হয় একটা মামলা থেকে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা রমা মুখার্জী একদিন তাঁর অফিসে আসে একটা মামলার ব্যাপারে বছর দুই আগে। ব্যাপারটা ছিল এই যে রমা এক ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট শেষ না হতেই অন্যএক কোম্পানিতে কাজ করছে ব'লে প্রথম কোম্পানি তার নামে কণ্ট্রাক্ট ভঙ্গ করবার জন্য নালিশ করেছিল। এই মামলার ব্যাপারে মিষ্টার চৌধুরী কয়েকবার রমার বাড়িতে যাতায়াত করেন এবং তারপর এই যাতায়াতটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে শেষে এমন অবস্থা হয় যে রমাকে ছাড়া সারা দুনিয়াটাই মিষ্টার চৌধুরীর ফাঁকা মনে হতে থাকে।

মামলার জন্য কিছুদিন রমার সুটিংএ যাওয়া বন্ধ ছিল। এই সময়টা মিষ্টার চৌধুরীর প্যাকার্ড গাড়ী প্রত্যহ অফিস ফেরত একবার রমার বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াত। প্রতিরাত্রেই মিষ্টার চৌধুরী চা এবং "ইত্যাদি প্রভৃতি" বহুরকমের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে শরীর ও মন চাঙ্গা করে বাড়িতে ফিরতেন। রমা সুন্দরী, আধুনিকা, ফড়ফড় করে ইংরেজী বলতে পারে, নাচতে পারে, গাইতে পারে, মনভোলানো গল্প করতে পারে, মোট কথা 'কাপ্তেন বধ' করতে যা দরকার সবই তার জানা।

মিষ্টার চৌধুরী বহু চেষ্টায় রমাকে মামলার জাল থেকে ছাড়ালেন বটে কিন্তু ওদিকে রমার জালে নিজেই যে কখন তিনি জড়িয়ে পড়েছেন সে কথা যখন তিনি বুঝতে পারলেন তখন আর সে জাল থেকে বার হয়ে আসবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। উদ্দাম লাম্পট্যলীলার উচ্ছল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলেন নিজেকে তিনি। স্ত্রী, কন্যা, সংসার, কর্তব্য সব একদিকে আর রমা একদিকে। মিষ্টার চৌধুরী তখন সব পরিত্যাগ করতে পারেন কিন্তু রমাকে ছাড়তে পারেন না। কলকাতার বুকে রমাকে নিয়ে যা খুশী করে বেড়াতে লাগলেন তিনি। দেশী বিলাতী, সব ক'টা হোটেল আর বার'-এর মালিক থেকে বয় পর্যন্ত এই প্রণয়ীযুগলকে অচিরেই চিনে ফেলল। রেস্, ডিনার, গার্ডেন পার্টি, রোইং, ষ্টীমার পার্টি এবং টাকা খরচের আরও যতরকমের রাস্তা আছে মিষ্টার চৌধুরীর চেক বইয়ের পাতা এর প্রত্যেক রাস্তাতেই চলতে আরম্ভ করল।

রমা যখন বুঝতে পারল যে মিস্টার চৌধুরী তার পরিপূর্ণ আয়ত্তে এসে গেছেন তখন সে একদিন বাহুপাশে বেঁধে আব্দার করে তাঁকে বলল "আমার অনেকদিনের আশা নিজে একখানা বাড়ি করি কিন্তু······

মিস্টার চৌধুরী রমার সমর্পিত দেহলতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার গালে একটা চুমো দিয়ে বললেন—"কিন্তু কি ?"

রমা। ঐ কিন্তুটাই তো যত বাধা—মানে টাকা!

মিস্টার চৌধুরী বললেন "সেজন্য আটকাবে না, একখানা বাড়ি তোমার চাই, এই তো ?"

সে রাত্রি আর রমা মিস্টার চৌধুরীকে কিছুতেই বাড়ি যেতে দিল না। রাত্রে কাছে শুয়ে রমা বলল "আমার বাড়ি হলে সেও তো তোমারই হবে, তুমি ছাড়া আমার আর কেই বা আছে বল ? ভাবছি ফিল্ম লাইনের কাজ ছেড়ে দেব, কিন্তু পারি না কেবল টাকার জন্যই। একটা কোম্পানি থেকে এর মধ্যেই 'অফার' এসেছে—ওরা মাসে দু'হাজার টাকা দিয়ে পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট করতে চায়, আমি কিন্তু তোমার মতামত না নিয়ে ফাইন্যাল কথা দিতে পারব না বলে দিয়েছি।"

মিস্টার চৌধুরী একেবারেই গলে যান এই কথা শুনে—রমা তাহলে মাসে দুহাজার টাকা আয়ের কাজও তাঁর জন্য ছাড়তে রাজী! একেই তো বলে সত্যিকারের ভালবাসা!

কিছুদিনের মধ্যেই রমার নামে লেকের কাছে জমি কেনা হয়ে গেল। এক প্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টর ফার্মকে বাড়ি তৈরির কন্ট্রাক্ট দেওয়াও হয়ে গেল। টাকায় কিনা হয়! কয়েক মাসের মধ্যেই রমার বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। বাড়ি তৈরি হবার পর রমার জন্য একখানা গাড়ীও কেনা হ'ল। এই বাড়ি হবার পর থেকে মিস্টার চৌধুরী প্রায় সেখানেই রাত কাটাতে আরম্ভ করলেন।

এদিকে ইট, চুন, সুরকি, সিমেন্ট, লোহা, কন্ট্রাক্টরের বিল, আসবাবপত্র, গাড়ী ইত্যাদিতে মিস্টার চৌধুরীর পঞ্চাশ হাজার টাকার মত ব্যয় হয়ে গেল। এই টাকাটা ছিল কোন এক

ধনী মক্কেলের গচ্ছিত টাকা। খরচ করবার সময় মিস্টার চৌধুরী ভেবেছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ মত আবার টাকাটা পুরা করে রাখবেন, কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না।

মিস্টার চৌধুরীর ফার্মের আর একজন অংশীদার ছিল। এঁর নাম সমরেন্দ্র চ্যাটার্জী। এই ভদ্রলোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে বহুদিন আগে সুইজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। ইনি ছিলেন মিস্টার চৌধুরীর বিশেষ বন্ধু তাই সুইজারল্যাণ্ড যাবার আগে ফার্মের সব কাজের ভার ইনি বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে যান। অনেকদিন পরে সুইজারল্যাণ্ড থেকে তিনি লিখেছেন যে, তাঁর অসুখ ভাল হয়ে গেছে আর দুই তিন মাসের মধ্যেই তিনি কলকাতা ফিরে আসছেন।

এই চিঠি পেয়ে মিস্টার চৌধুরীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কি সর্বনাশ! বন্ধু ফিরে আসবার আগেই যদি মক্কেলের গচ্ছিত টাকা আর বন্ধুর অংশের যে টাকাটা এই দুই বৎসরে তিনি ভেঙ্গে ফেলেছেন তা পুরা করে না রাখেন তাহলে মহাবিপদ হবে। মিস্টার চৌধুরী ভয়ানক ভাবিত হয়ে উঠলেন।

তাঁর ক্রীক রো'র বাড়িও ইতিমধ্যে হুণ্ডীর দায়ে বাঁধা পড়েছিল। দ্বিতীয়বার বাঁধা দিয়ে পূর্বের হুণ্ডী খালাস করে, তিনি মাত্র দশ হাজার টাকা জোগার করতে সক্ষম হলেন। এখনও বাকি প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। উপায়ান্তর না দেখে তিনি রমাকে একদিন সব কথা খুলে বলে অনুরোধ করলেন

"লক্ষ্মীটি! এই বিপদের সময় তুমি আমাকে বাঁচাও! এই বাড়িখানা বাঁধা দিলে হাজার বিশেক টাকা পাওয়া যাবে। ঐ টাকাটা পাওয়া গেলে আর বাকি টাকা এক রকম করে জোগার হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না। তোমার বাড়ি আবার আমি ছাড়িয়ে দিতে পারব।"

রমা চালাক মেয়ে। সে বুঝতে পারল যে মক্কেলের—টাকায় টান ধরেছে এবার! কিন্তু একবার হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে এরকম বোকা মেয়ে সে নয়।

রমা তখন চালাকি করে বলল—"এই সামান্য ব্যাপারে তুমি এত চিন্তা করছ! আমি ভাবলাম কি না কি! তোমাকে বাড়ি বাঁধা দিতে হবে না, আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠিক জোগার করে দিচ্ছি দেখে নিও!"

মিষ্টার চৌধুরী—"তুমি দেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগার করে? কি ভাবে?"

রমা। এক রাজাবাহাদুর আমার পেছনে কিছুদিন থেকে ঘুর-ঘুর করছে। সে বলে যে আমাকে হীরোইন করে সে একখানা ছবি করবে। ওকে একটু আস্কারা দিলেই—বুঝতে পারছ? The Great Raja Bahadur will not hesitate to part with a part of his fortune which may be fifty thousand or much more. তুমি কি বল? ফেলব এক টোপ?

মিষ্টার চৌধুরী—You naughty girl! But see that

I am not made a fool by your Great Raja Bahadur! শেষটায় টোপ ফেলতে গিয়ে নিজেই আবার গেঁথে না পড় ?

রমা অভিমানের সুরে বলে—"আমাকে কি তুমি সেই রকম মনে কর নাকি ?"

মিষ্টার চৌধুরী। না তা করি না বটে, তবে বলা তো যায় না, রাজাবাহাদুরী ধাক্কায় শেষে এই গরিব সলিসিটার তলিয়ে না যায়!

একটা বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে রমা বলল—"এত ভয় ?"

* * *

কয়েকদিন পরের কথা। মিস্টার চৌধুরী তাঁর অফিসে বসে আছেন, হঠাৎ রাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী এসে কার্ড পাঠাল। সে এসে মিস্টার চৌধুরীকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে তিনি যেন আর কখনও মিস্ রমা চ্যাটার্জীর বাড়িতে না যান কারণ রাজাবাহাদুর তাঁর রক্ষিতা স্ত্রীলোকের কাছে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির যাতয়াত পছন্দ করেন না।

মিস্টার চৌধুরী অফিসের মধ্যে আর এ বিষয়ে কোন হৈ চৈ না করে তৎক্ষণাৎ ছুটলেন রমার বাড়িতে। সেখানে চেনা দরোয়ানের পরিবর্তে সদরে নূতন এক নেপালী দরোয়ান দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে পাখী উড়েছে। তিনি বাড়িতে ঢুকতে

যেতেই নেপালী দরোয়ান বললো "ভিতর মৎ ঘুসিয়ে বাবুজী, কিসিকো অন্দর যানে কো হুকুম নেহি হ্যায়।

মিস্টার চৌধুরী তখন বাইরে দাঁড়িয়েই চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন—"রমা! একবার এদিকে এসে একটা কথা শুনে যাও!"

নেপালী দরোয়ান বলল "চিল্লাইয়ে মাৎ, মাইজী ঘরমে নেহি হ্যায়।"

অপমানে মিস্টার চৌধুরীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। ওখান থেকে ফিরে এসে কিছুক্ষণ পাগলের মত অনির্দিষ্টভাবে এখানে ওখানে গাড়ী চালিয়ে তিনি একটা বার'-এ ঢুকে আকণ্ঠ মদ্যপান করতে আরম্ভ করলেন। ওর মগজের মধ্যে তখন রমা, রাজাবাহাদুর, পুলিশ, কোর্ট, জেলখানা, মমতা, ইলা, শীলা, অজয়, ক্রীকরো'র বাড়ি, মক্কেলের গচ্ছিত টাকা সব কিছু মিলে একাকার হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল।

——

এগারো

অনুপমা কলকাতায় যে বাড়ি কিনেছিল সেখানা চিত্রতারকা রমা মুখার্জীর বাড়ির ঠিক পাশেই অবস্থিত। বাড়ি, মোটর, আসবাব পত্র সব কিছুতে তার ব্যয় হয় চল্লিশ হাজার টাকার কিছু বেশী। বাকি চার লাখ ষাট হাজার টাকার মধ্যে এটর্ণির পরামর্শ মত তিন লাখ টাকার কোম্পানির কাগজ আর এক লাখ টাকার কতকগুলো বাজার চলতি বড় বড় কোম্পানির শেয়ার কিনে বাকি টাকা সে কারেণ্ট একাউণ্টে লয়েডস্ ব্যাঙ্কে রেখে দিল। কোম্পানির কাগজ আর শেয়ারের ডিভিডেণ্ড থেকে বার্ষিক প্রায় বার হাজার টাকা সুদ আসবে এই রকম ব্যবস্থা করে অনুপমা কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। মাসিক প্রায় হাজার টাকা আয় একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে কম নয়।

অনুপমা এইবার চেষ্টা করতে লাগল কলকাতার সৌখিন আর ধনাঢ্য সমাজে মিশতে। একটা বিষয়ে কিন্তু অনুপমা এদের কাছে নিজেকে সব সময়ই ছোট মনে করতে আরম্ভ করল—সে বিষয়টা হচ্ছে তার শিক্ষার অভাব। অনুপমা স্থির করল যে সে লেখাপড়া শিখবে। বাড়িতে শিক্ষয়িত্রী রেখে অনুপমা লেখা-পড়া আরম্ভ করল। বছর দু'এর মধ্যেই সে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য এবং কিছুটা ইংরেজীও শিখে ফেলল। এ পর সে এক মেম সাহেব গভার্ণেস রেখে ইংরেজী ভাষা আর সেই সঙ্গে ইংরেজী আদব কায়দাও শিখতে লাগল।

এক বৎসরের মধ্যেই অনুপমা ইংরেজীতে চমৎকার কথাবার্তা বলতে শিখে গেল। এই তিন বৎসর অনুপমা বিশেষ কোন কাজ না থাকলে বাড়ির বার হ'ত না। তিন বৎসর পর সে যখন নিজেকে আধুনিক সমাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনে করল তখন থেকে সে সবার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করল। অনুপমার মত সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা ধনাঢ্য যুবতীর পক্ষে কলকাতার এ্যারিস্টোক্র্যাট্ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দেরি হ'ল না। দেখতে দেখতে অনুপমা ঐ সমাজের একজন 'হিট' হয়ে উঠল।

এই সময় একদিন রমা চ্যাটার্জীর সঙ্গে অনুপমার পরিচয় হয় একটা পার্টিতে। রমা ওখানে এসেছিল নাচতে। পরিচয় হওয়ার পর যখন রমা জানতে পারল যে এই সুন্দরী বিদুষী মহিলা তারই পাশের বাড়িতে থাকে তখন সে প্রায়ই অনুপমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করল। অনুপমার ব্যক্তিত্ব, তার শিক্ষা, তার মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যবহার এবং সর্বোপরি তার অর্থের সচ্ছলতা রমাকে অতি সহজেই আকৃষ্ট করল তার প্রতি।

একদিন কথায় কথায় রমা অনুপমাকে বলল—"আপনি যদি ফিল্মে আসতেন তা'হলে খুব ভাল হ'ত।"

অনুপমা। কেন বলুন তো?

রমা। আমাদের দেশের এ্যাকট্রেসদের মধ্যে সত্যিকারের শিক্ষিতা মেয়ে খুবই কম। তোতা পাখীর মত মুখস্ত করে পার্ট বলে যায় ওরা। ওতে অভিনীত চরিত্র ঠিক মত ফুটে ওঠে না—উঠতেই পারে না। আপনি যদি ফিল্মে নাবতেন তা'হলে

আমার তো মনে হয় যে film world'-এ একটা sensation পড়ে যে'ত।

অনুপমা। Film world তো শুধু বাংলা দেশ বা বোম্বাই নিয়ে নয় মিস্ চ্যাটার্জী! Film world-এ যারা নাম করেছে তাদের অভিনয় প্রতিভা যে কত উঁচু দরের তা গ্রেটা গার্বো, মার্লিন ডিয়েট্রিস, নর্ম্মা শিয়ারার, ক্লদেৎ কলবার্ট, এ'দের অভিনয় দেখলে বুঝতে পারতেন।

রমা। আপনি বুঝি খুব ইংরেজী বই দেখেন?

অনুপমা। খুব দেখি না, তবে ভাল বই এলে দেখি। এই ধরুন Sign of the Cross, Mary Antionett, Marly Walasca, Hunchback of Notre'dam, Life of Emil Zola, Great Dictator, All Quiet on the Western Front, Joan of Arc, Samson and Delaila, এ সব ছবি দেখলে আমাদের দেশের ছবি যে এখনও কত নিম্ন স্তরে রয়েছে তা বুঝতে দেরি হয় না।

রমা। আপনার তো দেখছি film' এ খুব ভাল taste আছে! একদিন আলাপ্ করুন না আমাদের ডিরেক্টারের সঙ্গে।

অনুপমা। বেশ তো! করলেই হবে একদিন।

এর দিন কয়েক পরেই—

একদিন সকাল প্রায় আটটার সময় অনুপমার ড্রইংরুমে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল। লোকটি শীর্ণকায়, কটা রঙ, লম্বা নাক, অনেকদিন তেল না দেওয়ায় রুক্ষ চুল, পরনে পাৎলুন,

গায় একটা জামা যার কোন নামকরণ করা সম্ভব নয়—সার্ট, কোট আর ব্লাউজ একত্র করলে তবে ঐ রকম জামার হদিশ পাওয়া যায়। মুখে মদের গন্ধ—কথা বললেই টের পাওয়া যায়।

অনুপমা খবরের কাগজ পড়ছিল। লোকটি এসেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করল—"আপনারই নাম অনুপমা দেবী?"

অনুপমা মুখ তুলে এই জীবটির দিকে তাকিয়ে বলল—"হাঁ, কি দরকার আপনার বলুন?"

লোকটি বলল—আমার নাম কমল ব্যানার্জী, ভুতুরিয়া ফিল্ম কোম্পানির আমি রিক্রুটিং অফিসার। শুনলাম আপনি নাকি ফিল্মে নাবতে চান—তাই দেখতে এলাম যে আপনার চেহারা স্ক্রিনে স্যুট করবে কি না? (অনুপমার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে) তা নিতান্ত অচল হবে না—আচ্ছা আপনি গান জানেন?

লোকটার অসভ্যতায় অনুপমা মর্মান্তিক চটে উঠেছিল। সে কোন উত্তর না দিয়ে কলিং বেল টিপে ধরল। দরোয়ান এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই অনুপমা হুকুম দিল "ইসকো নিকাল দো।"

লোকটার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। সে উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে যেতেই দরোয়ান ধমক দিয়ে বলল "চলিয়ে বাহার!"

পরদিন

"Mr. Samir Ghosh,
Film Director".

কার্ড এলো।

অনুপমা আগের দিনের লোকটার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই ছিল। আজ আবার ফিল্ম কোম্পানির লোক এসেছে দেখে নিজের মনেই সে বলে উঠল—"নাঃ—এরা বিরক্ত করলে দেখছি!"

অনুপমা জিজ্ঞাসা করল "এ লোক ভি কালওয়ালা বাবুকা মাফিক উজ্‌বুক্ হোনেসে বোল দো মোলাকাৎ নেহি হোগা।"

দরোয়ান। নেহি মাইজী। এ বাবু ভদ্দর আদমী আছে।

অনুপমা বলল "আচ্ছা উনকো ভেজ দো।"

ফিল্ম ডিরেক্টর মিস্টার সমীর ঘোষ প্রবেশ করল। ফিট-ফাট পোষাকে ছিমছাম চেহারা। এসেই যুক্ত করে অনুপমাকে নমস্কার করল সে।

অনুপমা লোকটিকে দেখে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল "যাক্ এ'লোকটা তাহলে কালকের লোকটার মত অভদ্র নয়!"

প্রতি নমস্কার করে অনুপমা বলল—"বসুন!"

সমীর। মিস্ চ্যাটার্জীর কাছে আপনার কথা শোনা অবধি ভাবছি—আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব কিন্তু ষ্টুডিওতে এ'কদিন সমানে ডে এণ্ড নাইট স্যুটিং চলছিল তাই সুবিধা করে উঠতে পারি নি।

অনুপমা। আপনি এখন কোন্ কোম্পানির হয়ে ছবি তুলছেন?

সমীর। প্রোডাক্‌ষনটা করছে এক নূতন প্রডিউসার ছবি তোলা হচ্ছে ভুতোরিয়া ফিল্ম কোম্পানির ষ্টুডিওতে।

অনুপমা হেসে বলল "দুনিয়ায় এত নাম থাকতে ভূতুরিয়া নাম হ'ল কেন? ভূতের ব্যাপার নাকি?

সমীর। প্রায় তাই! ব্যাপারটা হচ্ছে যে ষ্টুডিওর মাড়োয়াড়ী মালিকের পদবী ভুতোরিয়া, সাগরমল ভুতোরিয়া, তাই কোম্পানির নাম দিয়েছে "ভুতোরিয়া ফিল্ম কর্পোরেশন"।

অনুপমা। কাল যে লোকটা এসেছিল ওকে আপনি পাঠিয়েছিলেন?

সমীর। হ্যাঁ, ওকে বলেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে হ'লে কখন এলে আপনার সুবিধা হবে সেই কথাটা জেনে যেতে, তা কাল থেকে লোকটার আর দেখাই নেই। যত সব থার্ডক্লাস লোক নিয়ে কাজ করতে হয় আমাদের, আর বলবেন না।

অনুপমা। ও রকম লোককে আপনি আর কখনও আমার কাছে পাঠাবেন না।

সমীর। কি হয়েছে বলুন তো?

অনুপমা। ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার বলে কিছু ওর জানা নেই।

সমীর। I am very sorry for this. বাঁদরটা এসে বোধ হয় বলেছিল যে ও হচ্ছে রিক্রুটিং অফিসার।

অনুপমা। সুধু কি তাই, ও এসেই আমাকে পরীক্ষা করা আরম্ভ করল যে আমাকে স্ক্রিণে মানাবে কি না, পরে বললো "আপনি গান জানেন ?" লোকটাকে আমি দারোয়ান দিয়ে বার করে দিয়েছি।

সমীর। বেশ করেছেন! ইডিয়টটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়াই উচিত।

অনুপমা। আপনি এখন যে ছবি তুলছেন কি নাম দিয়েছেন সে ছবির ?

সমীর। ছবির নাম হচ্ছে—"স্বয়ম্বরা"

অনুপমা। পৌরাণিক ব্যাপার নাকি ?

সমীর। মোটেই নয়! প্রডিউসারের ইচ্ছা ; তার কোন্ এক বন্ধু নাকি এ বইএর কাহিনী লিখেছে—সিনারিও লিখতে তো আমার প্রাণান্ত ব্যাপার, না আছে বইতে কোন নাটকীয় পরিবেশ আর না আছে ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য। কি করি। অবশেষে ঐ বাজে মালই চালাবার জন্য কণ্ট্রাক্ট করলাম। ওর ভেতরে কতকগুলো ডান্স, আর নায়ক নায়িকার মুখে কয়েকটা প্রেমের গান দিলেই দেখবেন মার মার কাণ্ড!

অনুপমা। এ রকম বই আপনি কণ্ট্রাক্ট করেন কেন ?

সমীর। না করে উপায় কি ? এসব বাছতে গেলে আর টাকা রোজগার করা চলে না। আরও কত কি আছে এ লাইনে—প্রডিউসারের সঙ্গে হয়তো কোন মেয়ের ভাব হ'ল, অমনি হুকুম হবে সেই মেয়েটিকে নায়িকা না হলেও একটা ভাল

সাইড রোল দিতে হবে। এই রকম প্রায় সর্বত্রই, ডিরেকটারের রিকমেণ্ডেসন, ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ডরেকর্ডিষ্ট, ল্যাবরেটারি ইনচার্জ্জ, প্রত্যেকেরই রিকমেণ্ডেসন, অনুরোধ সব কিছু বিচার বিবেচনা করে তারপরে আর্টিষ্ট select করতে হয়। অবশ্য I dont mean to say যে এই সব recommended আর্টিষ্টরা সবাই বাজে।

অনুপমা। আপনাদের এই বইতে নামকরা আর্টিষ্ট কে কে আছেন?

সমীর। তা বলতে গেলে বাংলার উদিত ও উদীয়মান সিনেমা সৌরজগতের অনেক জ্যোতিষ্কই আছেন—এই ধরুণ নটস্যূর্য্য ফণীন্দ্র চৌধুরী, নটচন্দ্র কালিদাস বন্দোপাধ্যায় তাছাড়া তারকাদের মধ্যেও আছেন শুক্লা দেবী, নন্দিতা দেবী এবং আরও অনেকে।

অনুপমা। আচ্ছা এইসব উপাধি—এই যেমন নটস্যূর্য্য, নটচন্দ্র, এসব কে দেয়?

সমীর। ও একটা স্বায়ম্ভুব ব্যাপারের মত। স্বয়ম্ভূ মুনির নাম জানেন? অর্থাৎ নিজেই ঋষি। সেই রকম আর কি!

এসব উপাধি আমার মনে হয় কোন থিয়েটার কোম্পানি প্রথম তাদের পোষ্টারে ছাপে। তারপর থেকেই ক্রম-বিকাশের গুণে বর্তমানে ডালপালা গজিয়ে বহু উপাধি বাজার চলতি হয়ে গেছে।

একটু থেমে সমীর আবার বলে "সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র তো প্রায় শেষ, এখন বোধ হয় "নটজোনাকী" "নটপ্রদীপ" এসবও দেখতে পাওয়া যাবে।"

অনুপমা। নটজোনাকী! চমৎকার উপাধিটি তো! এটি কারা পাবেন?

সমীর। এ হবে তাদের জন্যই যারা সবে আলোক বিকিরণ সুরু করেছেন, অর্থাৎ দু'একটা সাইড রোলে উৎরে গেছেন।

অনুপমা। যাকগে ও সব চন্দ্র সূর্য্যের কথা, বলুন তো একখানা ভাল ছবি তুলতে কত খরচ হয়?

সমীর। ফ্লোর ভাড়া করে ড্রইংরুম ড্রামা করলে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার মধ্যেই হয়ে যায়; কিন্তু বেশী আউটডোর সুটিং করতে হলে সত্তর আশী হাজারের কমে হয় না। অবশ্য নূতন আর্টিষ্ট নিয়ে ছবি তুললে তবেই এইরকম খরচ। নামকরা আর্টিষ্ট নিতে গেলে অনেক বেশী খরচ হবে।

অনুপমা। ছবি ভাল হলে কি রকম লাভ আশা করা যায়?

সমীর। তেমন উৎরে গেলে ছবি তোলার খরচের বিশ পঁচিশ গুণ বেশীও পাওয়া যায়। আবার এমনও হয় যে খরচও উঠে না। সবই depend করে ছবির ভালমন্দর উপরে; অবশ্য প্রচারও এ বিষয়ে খুব সাহায্য করে। কেন আপনার ছবি প্রডিউস করবার ইচ্ছা আছে নাকি?

অনুপমা। করে দেখলে হয় একখানা! তাছাড়া আমি প্লে করলে নিজের ছবিতেই করব।

সমীর বুঝল যে মক্কেল মোটা ! সে তখন যথাসম্ভব ছবির লাভের দিকটাই অনুপমাকে বোঝাতে লাগল।

সব কিছু শুনে অনুপমা বলল "আপনি আর একদিন আসবেন, আমি একটু ভেবে দেখি, আর in the mean time ছবির উপযুক্ত কোন ভাল বই পেলে আমাকে একবার জানাবেন।

ভবিষ্যতে আর একখানা ছবির কাজ পাবে এই আশায় সমীর সেদিন উৎফুল্ল হৃদয়েই অনুপমার কাছ থেকে বিদায় নিল। অবশ্য তার উৎফুল্ল হওয়ার অন্য কোন কারণও যে থাকতে পারে না তা নয়।

বার

"আমার জেলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।"

মিস্টার চৌধুরীর মুখে এই কথা শুনে অজয় একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। ওঁর অবস্থা যে এত ভয়ানক হয়ে উঠেছে সে কথা বাড়ির কেউই আজ পর্যন্ত জানতে পারে নাই। আজ সারাদিন মিস্টার চৌধুরী শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে থেকে সন্ধ্যার একটু পরে অজয়কে ডেকে পাঠান। অজয় এলে তাকে সব কথা বলে অবশেষে বলেন যে তাঁর জেলে যাওয়া ছাড়া পথ নাই।

রমা ঘটিত ব্যাপারটা বাদ দিয়ে যতটা বলা সম্ভব, অর্থাৎ মক্কেলের গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করা, বাড়ি বাঁধা দেওয়া সব কিছুই তিনি অজয়কে বলেন

অজয় কখনও মিস্টার চৌধুরীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে একটা কথাও বলে নাই আজ পর্যন্ত। এ বাড়িতে আসবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই মহানুভব লোকটির দয়াতেই সে লেখাপড়া শিখে আজ গ্রাজুয়েট হ'তে পেরেছে। আর এই পরোপকারী মানুষটি আজ জেলে যেতে চলেছেন! অজয় ভাবল যে তার যদি সাধ্য থাকত তাহলে যেমন করেই হোক সে মিস্টার চৌধুরীকে বাঁচাতো। কিন্তু এ যে অনেক টাকা! এত টাকা সে কোথায় পাবে! সে কি বলবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় মিষ্টার চৌধুরী বললেন—"তোমাকে আমি নিজের ছেলের মতই মনে করি, তাই তোমাকে আমি আজ ডেকেছি কয়েকটা কথা বলতে। ইলার বিয়ে দিয়েছি, সুখে হোক দুঃখে হোক তার চলে যাবে, কিন্তু চিন্তা হচ্ছে আমার অবর্তমানে সংসার কি করে চলবে? এ বাড়ি হয়তো ওরা হুণ্ডীর দেনার দায়ে নিয়ে নেবে। বাজারে আমার দেনা ছাড়া আর কিছু নেই। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি যে আমার absence'এ ওদের তুমি দেখো।

অজয়। আমাকে এভাবে পর মনে করে কথা বললে আমি দুঃখ পাই। ছেলেবেলায় মা বাবাকে হারিয়েছি কিন্তু আপনার আশ্রয়ে থেকে এতদিন আপনাকে আমি আমার বাবার মতই মনে করে এসেছি। আমার মা বোনকে আমি যেমন করেই হোক দেখব, কিন্তু আপনার কি কোনই উপাই নেই বাঁচবার?

মিস্টার চৌধুরী—। না। Criminal Breach of Trust আমার against'এ প্রমাণিত হবেই। যাক্ যা হবার হবে, আমার সুধু দুঃখ হয় শীলার কথা ভেবে, কি করে ওর বিয়ে দেব? লোকে যখন জানবে যে ওর বাবা একজন criminal তখন কি কেউ ওকে বিয়ে করতে চাইবে?

* * *

হাইকোর্ট সেসনের বিচারে জুরীদের সর্বসম্মত অভিমত গ্রাহ্য করে বিচারপতি রায় দিলেন—"I agree to and accept

the unanimous verdict of the Juri and direct that the accused Satya Prakash Roy be sentenced under Section 409 of the Indian Penal Code to undergo rigorous imprisonment for a term of three years, and under Section 467 of the Indian Penal Code to undergo rigorous imprisonment for another three years. Both the sentences are to run concurrently."

বিচারপতি রায় শুনিয়ে দিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুইজন পুলিশ সার্জেণ্ট মিস্টার চৌধুরীকে ফাটকে নিয়ে গেল।

অজয়, শীলা, মিসেস চৌধুরী আর ইলা উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে মিস্টার চৌধুরীর দিকে। ওদের সবার চোখেই তখন জল। আদালতের কাজ সেদিনের মত শেষ হয়ে গেল। হাইকোর্টের একজন এটর্ণির বিচার হচ্ছে বলে বহু এ্যাড্‌ভোকেট, ব্যারিস্টার, আর এটর্ণি সেদিন মামলা দেখতে উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ বলল "disgrace."

কোর্ট থেকে ফিরে এসে সেই যে মিসেস চৌধুরী শয্যা গ্রহণ করলেন আর সে রাত্রি তিনি উঠলেন না। শীলা একখানা চেয়ারে ঠায় বসে আছে। অজয় একবার মিসেস চৌধুরীকে আর একবার শীলাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতে লাগল। সে রাত্রি ওদের অনাহারেই গেল। পরদিন সকালে উঠেই অজয় শীলাকে সঙ্গে করে মিস্টার চৌধুরীর বন্ধু এবং তাঁর পক্ষের

ব্যারিস্টার মিস্টার সান্যালের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল "জেলখানায় ওঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না ?"

মিস্টার সান্যাল। যায়।

অজয়। আজ দেখা করা যায় ?

মিস্টার সান্যাল। যায়। তুমি বিকালে প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে একখানা দরখাস্ত লিখে নিয়ে যেও, জেলখানায় দরখাস্তখানা দিলেই দেখা হবে।

বিকাল বেলা অজয়, শীলা আর মিসেস চৌধুরী প্রেসিডেন্সী জেলে মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করল। মিসেস চৌধুরী স্বামীকে দেখেই কেঁদে ফেললেন।

জেলের কয়েদীকে আর মিস্টার চৌধুরী বললে ভাল শোনায় না তাই এরপর থেকে আমরা মিস্টার চৌধুরীকে সত্যপ্রকাশ নামে আর মিসেস চৌধুরীকে মমতা নামে অভিহিত করব।

সত্যপ্রকাশ বলল "দু'একদিনের মধ্যেই আমাকে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলি করবে, এরপর তোমরা আমার সঙ্গে ওখানেই দেখা করতে যেও।"

মমতা জিজ্ঞাসা করল—"ওখানে পাঠাবে কেন ?"

এই কথায় যে ডেপুটী জেলার ইণ্টারভিউতে উপস্থিত ছিল সে জানাল যে "যারা casual offender তাদের এই জেলে রাখবার নিয়ম নেই, এখানে শুধু habitual convict-রাই থাকে।

মমতা। এখানে ওঁকে কি খেতে দেওয়া হয় ?

ডেপুটী জেলার। ও সব কথা জিজ্ঞাসা করে লাভ কি ? তবে ইনি Division II convict বলে ভাল খাবারই পাবেন।

মমতা। তোমাকে এখানে কি কাজ করতে দেবে ?

সত্যপ্রকাশ। সে ঐ জেলে গিয়ে ঠিক হবে।

শীলা। বাবা তুমি চিঠি লিখতে পারবে না ?

সত্যপ্রকাশ। পারব নিশ্চয়ই, তবে ক'খানা চিঠি লিখতে পারব তা জানি না।

ডেপুটী জেলার। Division II convictরা মাসে দুখানা চিঠি লিখতে পারে আর মাসে দুবার interview পায়। চিঠির পরিবর্ত্তে interview আর interview এর পরিবর্তে চিঠি লিখতেও দেওয়া হয়।

অজয় হিসাব করে বলল "তাহলে আমরা মাসে চারবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?"

ডেপুটী জেলার। তা পারেন যদি ইনি চিঠি না লেখেন।

সত্যপ্রকাশ ডেপুটী জেলারকে জিজ্ঞাসা করে—"আমাকে তাহলে কবে ও জেলে transfer করবেন ?"

ডেপুটী জেলার। সে কথা বলা নিষেধ, তবে খুব শীগ্-গীরই, এমন কি কালও হ'তে পারে।

সত্যপ্রকাশ মমতাকে বলল তোমরা তাহলে এখন যাও, গাড়ীখানা আর বাড়ির furniture গুলো বিক্রি করে দিও কারণ বাড়ি বোধ হয় বেশীদিন থাকবে না।

শীলা। আমরা কিছু খাবার নিয়ে এসেছিলাম বাবা!

ডেপুটী জেলার। খাবার তো allow করা হবে না,. কারণ কোন পর্বদিন ছাড়া কয়েদীদের বাইরের খাবার দেওয়া হয় না। আচ্ছা আপনারা এখন তাহলে যান, আর বেশী সময় দিতে পারি না।

একজন গোরা ওয়ার্ডার সত্যপ্রকাশকে বলল—"Come on"

তের

শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানা ছোট ফ্লাট ভাড়া ঠিক করে এসে অজয় বলল "মা, বাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, এইবার তাহলে গাড়ি ডেকে নিয়ে আসি ?"

হুণ্ডীর দেনার দায়ে বাড়ি নিলাম হয়ে গেছে। নোটীশ এসেছে বাড়ি ছেড়ে দিতে। কালই বাড়ি ছেড়ে দিবার শেষ তারিখ।

শীলা জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় বাড়ি ঠিক করলে দাদা ?"

অজয়। শ্যামবাজার, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউতে। ছোট্ট দুইরুমের ফ্লাট কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন। আলো হাওয়াও মন্দ নয়।

মমতা। তোমরা যা হয় কর, আমার মনটা আজ ভাল নেই।

না থাকবারই কথা। এতদিনের আশ্রয় এই বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে! মমতা যেন আর সহ্য করতে পারছিল না তার ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিণতিকে।

চাকর বাকরদের আগেই বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল। জিনিষপত্র বাঁধা ছাঁদা করে অজয় একখানা ট্রাক ভাড়া করে এনে তাতে সব বোঝাই দিয়ে একখানা ট্যাক্সি ডেকে এনে বলল—"চলুন মা, গাড়ী এসে গেছে !"

নিঃশব্দে মমতা শীলাকে নিয়ে রাস্তায় বার হয়ে এল। আশেপাশের বাড়ি থেকে মেয়েরা, গিন্নীরা অনেকেই এসে

মমতাকে অনুরোধ করল যেন সুবিধা পেলেই এসে তাদের সঙ্গে দেখা করে সে।

ট্যাক্সি স্টার্ট দিতেই মমতা বাড়ি খানার দিকে শেষবারের মত তাকায়। নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার নাক দিয়ে। জন্মের মত বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ওদের সবারই চোখ জলে ভরে ওঠে। সহরের কোলাহল, ট্রামের ঠনঠন শব্দ, বাসের ভোঁসভোঁস, ট্যাক্সির হর্ণ সব কিছুই আজ ওদের কানে যেন বিষাদের সুরে বাজতে থাকে।

নূতন বাড়িতে উঠে আসবার পর আজন্ম অনভ্যস্তা শীলা রান্না ঘরের ভার নিল। অজয় সকালে উঠে বাজার করে নিয়ে আসত আর শীলা সেই বাজার গুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। মমতা কোন কাজই দেখত না, চুপ করে একা ঘরে বসে সব সময় যেন কি সব ভাবত। অজয় আর শীলা তু'জনে তরকারী কুটে, চাল ধুয়ে মাছ কুটে রান্নার কসরৎ করতে থাকে। মাছ কুটতেই হয় শীলার সবচেয়ে বেশী অসুবিধা।

কেবল হাত থেকে ফসকে যেতে চায়। শীলা বলে—"তুমি কি সব বাজে মাছ কিনে আন দাদা, এগুলো কি করে কোটে মানুষে?"

অজয় বলে "তুমি পার না তাই, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে মাছ কুটতে হয়।" দেখাতে গিয়ে হাত কেটে ফেলে অজয়। শীলা বলে "থাক খুব হয়েছে, আর কেরদানী দেখাতে

হবে না, কাল থেকে আঁশ ছাড়া মাছ আনবে বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

সকাল আটটায় রান্না বসিয়ে বেলা ১টায় যা নামে সেগুলো বেড়ে নিয়ে মুখে দিতে গিয়ে ওরা এ ওর মুখের দিকে তাকায়। শীলা বলে ছিঃ ছিঃ এসব কি খাওয়া যায়। দাঁড়াও কালই আমি পাশের ফ্লাটের বউদির কাছে রান্না শিখে নিচ্ছি।

এমনি করেই ওদের দিন কাটে। হাতের টাকা কড়ি ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসতে থাকে। অজয় বলে এভাবে বসে খেলে তো চলবে না শীলা, কাল থেকে তুমি একটু সকাল সকাল রান্না করে দিও। আমি চাকরির খোঁজে বার হ'ব।

অজয় ইউনিভার্সিটির ফার্ষ্ট হয়ে বি, এ, পাশ করেছিল কিন্তু চাকরি খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেল যে তার কোন দামই নেই। যেখানেই যায় শোনে "No vacancy" প্রতিদিন অজয় একখানা করে "Statesman" কিনে আনে কারণ ওতে Situation vacant এর অনেক বিজ্ঞাপন থাকে। অজয় প্রত্যহ চারপাঁচ খানা করে দরখাস্ত ডাকে পাঠায়।

প্রতিদিন দুপুরে সে বার হয় প্রাণে নুতন আশা নিয়ে আর সন্ধ্যার আগে ফিরে আসে পরিশ্রান্ত দেহটিকে কোন রকমে টেনে নিয়ে, হতাশ হৃদয়ে, শুকনো মুখে।

এর মধ্যেও কিন্তু ওরা নিয়মিত ভাবে প্রতি সপ্তাহে রবিবার দিন আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে গিয়ে সত্যপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করে আসে। ওরা জানতে পারে যে তাকে জেল হাসপাতালে লেখাপড়ার কাজ করতে দেওয়া হয়েছে।

সংসারের কাজে এখন শীলা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে রান্না করে, সাবান দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করে, সংসারের সব কাজই এখন সে নিজের হাতে করে, কেবল একটা ঠিকা ঝি সকালে একবার এসে এঁটো বাসনপত্রগুলো মেজে দিয়ে যায়। ঘুঁটে, কয়লা, দেশলাই এ সবের দিকেও শীলার এখন সতর্ক দৃষ্টি ; পাছে অপচয় হয়।

মমতা মাঝে মাঝে বলে—"তুই রাখ মা, আমি করছি।"

হাসিমুখে শীলা বলে—"এতকাল তো তুমিই সংসার চালিয়েছো, এবার না হয় আমিই দুদিন সংসার করে দেখি!"

শীলা একদিন বলল—"দাদা আমি ভাবছি আমিও কাল থেকে চাকরির চেষ্টায় বার হ'ব, যা লেখাপড়া জানি এতে স্কুলের টীচার হ'তে তো পারব।

অজয় বলে "হয়েছে! তোমাকে আর দিদিমণি হ'তে হবে না।"

শীলা। কিন্তু এভাবে বসে বসে খেলে আর ক'দিন চলবে ভেবেছ? হাতের টাকা কড়ি তো ফুরিয়ে এল।

অজয়। তুমি দেখে নিও শীলা, শীগ্‌গীরই আমি কোন কাজ পেয়ে যাব।"

একদিন কি একখানা পত্রিকায় শীলা "জাপানের মেয়েরা কি করে কাজ করে" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পড়ে মনে মনে চিন্তা করল যে সে যদি একটা ছোটখাট রকমের শিল্প স্থাপন ক'রে গরিব মেয়েদের দিয়ে কাজ করায় তাহলে মন্দ হয় না! কিন্তু

কি করা যায়? মেয়েরা এমন কি কাজ করতে পারে! শীলা স্থির করল যে সে একটা টেলারিং কারখানা করে ইজের, সায়া আর ছেলেদের জামা এইসব তৈরি করবে।

অনেক চেষ্টা করে মাসিক আট টাকা ভাড়ায় একখানা একতলার ঘর ভাড়া করে দুটো সিঙ্গার সেলাইকল নিয়ে শীলা তার কারখানা স্থাপন করল। নাম দিল "মহিলা শিল্পাশ্রম"। তখনও শীলার হাতে কিছু টাকা ছিল, ও থেকেই কিছু টাকা নিয়ে প্রয়োজনীয় ছিটের কাপড়, সূতা, কাঁচি ইত্যাদি কিনে এনে প্রথমে মাত্র তিনটি মেয়েকে নিয়ে শীলার কারখানায় কাজ আরম্ভ হ'ল। প্রথম মাসে মাল বিক্রি না হওয়ায় কিছু লোকসান হ'ল। শীলা এতে দমে না গিয়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। দ্বিতীয় মাসে কয়েকজন ফেরিওয়ালা এসে ওদের তৈরি জামা ইজের কিনে নিয়ে গেল। হিসাব করে শীলা দেখতে পেল যে প্রথম মাসের লোকসান মিটিয়েও লাভ হয়েছে মোট ১১০৲ টাকা। ও থেকে যারা কাজ করছে তাদের প্রত্যেককে ১৫৲ টাকা হিসাবে দিয়ে বাকি টাকায় আবার কাপড় কিনে আনল। এইভাবে মাত্র পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই শীলার কারখানা বেশ চালু হয়ে উঠল। আরও দুটো সেলাই কল নিল সে। কাজ করবার মেয়েও তখন বেড়ে গিয়ে হয়েছে আট জন।

এদিকে অজয়ও এক ফিল্ম কোম্পানির সেক্রেটারীর কাজ পেয়ে গেল, দেড়'শ টাকা মাইনেতে। কি করে অজয় এ কাজ পায় পরবর্তী অধ্যায়ে সে কাহিনী বিবৃত হচ্ছে।

চৌদ্দ

রূপাঞ্জলী পিকচারস্’এর মালিক বলে যতটা না হোক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে অনুপমার নাম আজ কে না জানে! দেয়ালে দেয়ালে অনুপমার ছবি আঁকা পোষ্টার! দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকা সমূহ অনুপমার প্রশংসার মুখর। তার নানা ভঙ্গীর বহু ছবি রাস্তায় বিক্রি হচ্ছে। ক্যালেণ্ডারে, সাবানের বিজ্ঞাপনে, স্কুলের ছাত্রের খাতার মধ্যে কলেজের ছাত্রের ঘরের দেয়ালে, যুবকের আংটিতে, আজকাল অনুপমার ছবি! অনুপমা শাড়ী, অনুপমা নেকলেস, অনুপমা দুল, অনুপমা ব্লাউজ, এমনকি জুতার দোকানে অনুপমা ‘সু’ পর্যন্ত বার হয়ে গেছে। পার্কে, চায়ের দোকানে, অফিস, স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং, সর্বত্রই অনুপমার আলোচনা।

বহুদিনের অতৃপ্ত বাসনা অনুপমার আজ পূর্ণ হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ আজ অনুপমাকে চেনে। দৈনিক শত শত চিঠি আসে তার নামে, কত বিচিত্র ভাষায়, কত কবিতায় ভরা সে সব চিঠি!

অনুপমার কাজ এখন ভয়ানক বেড়েছে। কোম্পানির অফিসিয়েল কাজকর্ম দেখা, ডিস্‌ট্রিবিউটারদের সঙ্গে দর কষাকষি করা, ভাল হাউসে ছবি রিলীজ্ করবার ব্যবস্থা করা, প্রচারের ব্যবস্থা করা, বহু রকমের লোকের সঙ্গে দেখাশুনা করা—এছাড়াও আছে পরবর্তী ছবির জন্য বই বাছাই করা,

আর্টিস্ট সিলেক্ট্ করা, কি করলে ছবি ভাল হবে ডিরেক্টর্, ক্যামেরাম্যান্ প্রভৃতির সঙ্গে সে নিয়ে পরামর্শ করা ; শূটিং য়্যাটেণ্ড্ করা ইত্যাদি। এত কাজের চাপে সময় সময় অনুপমা দিশেহারা হয়ে যায়।

ডিরেক্টর্ একদিন বলল "আপনি একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখুন! না হলে এত কাজ সামলাবেন কি করে?"

"স্টেট্‌স্‌ম্যান্"এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। একগাদা দরখাস্তে একখানা ফাইল ভরতি হয়ে গেল। পার্সন্যাল ইণ্টার্‌ভিউ নিষেধ থাকলেও কয়েকজন অতি উৎসাহী যুবক দেখা করতে এসে ধমক খেয়ে ফিরে গেল।

এই সময় একদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় চাপরাসী একখানা কার্ড এনে সেলাম করে অনুপমার হাতে দিল—

কার্ডখানি এই রকম :—

Phone B. B. 12345

Ajoy Kumar Dutt, B. A.

28/19 Creek Row,
Calcutta.
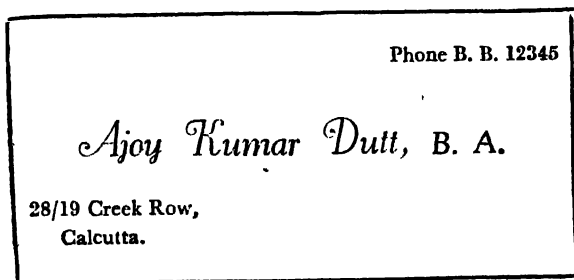
সাধারণতঃ কার্ড দিয়ে যারা দেখা করতে আসে তারা অভিজাত শ্রেণীর লোক। বিশেষ করে কার্ডে যদি ফোন্ নম্বর

থাকে তো আভিজাত্য আরও কয়েক ডিগ্রী উপরে ওঠে, এই কার্ড খানায় ফোন্ নম্বর থাকায় অনুপমা লোকটিকে পাঠিয়ে দিতে বলল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই একজন সুদর্শন যুবক ঘরে ঢুকে নমস্কার করতেই অনুপমা প্রতি নমস্কার করে বলল—"বসুন!"

অজয় আসন গ্রহণ করে বলল—"Statesman"এ···

অনুপমা একটু রুক্ষ ভাবেই জবাব দিল "Personal interview বারণ ছিল দেখতে পান নি?"

অজয়। প্রয়োজন যখন গুরুতর তখন আর দরখাস্তর গাদায় ঢুকে প্রতীক্ষায় না থেকে ভাবলাম সামনাসামনিই দেখা করে ভাগ্য পরীক্ষা করে আসি। যদি অন্যায় করে থাকি—বলেন তো চলে যাচ্ছি।

অনুপমা। য়্যাপ্লিকেশন্ এনেছেন?

অজয়। না, ভাবলাম যে কথা বলে যদি সুবিধা মনে হয় তাহলে application লেখাতো দু'মিনিটের ব্যাপার, আর সুবিধা না বুঝলে টাইপ্ করার চার আনা পয়সা বেঁচে গেল।

অজয়ের কথাবার্তায় এমন একটা নির্ভিক আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ছিল যা অনুপমার তথাকথিত বন্ধুবান্ধব আর স্তাবকদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। তার বন্ধুরা বড়লোক হ'তে পারে কিন্তু কথায় কথায় ওরা তাকে এত বেশী প্রশংসা করে যতটা প্রশংসা অনুপমার নিজেরই সময় সময় বাড়াবাড়ি মনে হয়।

অনুপমা বলল "আমার এখানে কাজ করতে হ'লে বহু রকম মেয়ের সঙ্গে আপনাকে মেলামেশা করতে হ'বে, আর জানেন তো—ফিল্মের মেয়েরা বেশীর ভাগই ভদ্রঘরের মেয়ে নয়! সে সব কথা ভেবে দেখেছেন কি?"

অজয়। অত ভাবাভাবি করে আসবার আমার সময়ই ছিল না। আজই সকালে আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখতে পাই তাই কপাল ঠুকে চলে এসেছি। আর কাজ করতে হ'লে অত সব বাছাবাছি করতে গেলে চলবেই বা কেন?

অনুপমা। আপনার বাড়িতে তো দেখছি ফোন্ আছে! অবস্থা খারাপ হলে তো বাড়িতে ফোন থাকে না! তাহলে প্রয়োজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তার সঙ্গে সঙ্গতি থাকে কোথায়?

অজয়। ফোন্ এখন নেই তবে ছিল, আর ঠিকানাও এখন ওখানে নেই, বর্তমান ঠিকানা তেরর আট ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ।

অনুপমা। আপনি কোন পরিচয় পত্র দিতে পারবেন?

অজয়। না।

অনুপমা। না মানে! যাকে engage করতে যাচ্ছি সে কি পলাতক আসামী না জেলখাটা দাগী, এটা জেনে নেওয়া আমি দরকার মনে করি।

ঠিক এই সময় অনুপমার কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার বিনয় দাশগুপ্ত কি একটা কাজে ঘরে ঢুকে অজয়কে ওখানে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে—"অজয় তুই এখানে! কি ব্যাপার বল

তো ? তোর যে আর দেখাই নেই। অনুপমা দেবীর সঙ্গে তোর পরিচয় আছে আগে তো কখনও জানাস্ নি ?

অনুপমা জিজ্ঞাসা করল—"আপনি এঁকে চেনেন নাকি মিস্টার দাশগুপ্ত ?"

বিনয়। খুব ভাল চিনি ! ও যে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ! আমরা একসঙ্গে বি, এ দিই। ও Universityর first হয়ে পাশ করে।"

অজয় বাধা দিয়ে বলে—"তুই থাম তো বিনয় ! ওরকম first অনেকেই হয়।"

বিনয়। কিন্তু এখানে এসেছিস কেন বললি না তো ?

অজয়। চাকরির দরখাস্ত নিয়ে।

বিনয় যেন গাছ থেকে পড়ে—"চাকরি করবি তুই ! কি দুঃখে বল তো ?"

অজয়। আমরা এখন যে কোন গরিবের থেকেও বেশী গরিব হয়ে গেছি ভাই, সে কথা পরে শুনিস্।

অনুপমা। বিনয় বাবু যখন আপনার বিশেষ বন্ধু, এ অবস্থায় আপনাকে appoint করতে আমার আপত্তি নেই। আপনি তাহলে কাল থেকেই join করুন। এখন মাসে দেড়'শ টাকা পাবেন। চলবে তো ?

অজয় বলল—চলা না চলা ব্যাপারটা একটা philosophical ব্যাপার অনুপমা দেবী !

অনুপমা। কি রকম ? (মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে তার)

অজয়। মনে করুন রাস্তার একজন ভিখারী, যার কোন আয় নেই, বাড়ি ঘর নেই, তারও চলে যাচ্ছে। আবার একজন কেরাণী যে মাসে ত্রিশ টাকা আয় ক'রে তেরটি সন্তানের জনক সেজে বসেছে তারও চলছে, আবার একজন নামকরা ব্যারিষ্টার যে মাসে পাঁচ হাজার টাকা আয় করছে তারও চলছে। কথা হচ্ছে এই চলার মাপকাঠি নিয়ে?

অনুপমা হেসে বলল—"বেশ আর একদিন আপনার সঙ্গে চলা না চলার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হবে, আপনার বন্ধু হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। আপনি তাহলে ওঁর ঘরেই যান।

অজয় অনুপমাকে নমস্কার করে বন্ধুর সঙ্গে চলে গেল।

পনর

শশীকান্ত অনেক দিন হয় মারা গেছে। ললিতার শরীরও এখন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। অনেক আগেই তার শরীরে ক্ষয় রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। মাঝে কিছুদিন ভাল থেকে আবার তার জ্বর হওয়া আরম্ভ করেছে। সংসারে এখন নিরুপমা আর একটি চাকর ছাড়া আর কোন লোক ছিল না। নিরুপমার এক দেওর কলকাতায় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ত। উপায়ান্তর না দেখে সে তাকেই চিঠি লিখল কলকাতায় একখানা বাসা ঠিক করতে।

ললিতা এখন প্রায়ই মেয়েকে বলে—সংসারে কারো ভাল করেই গেলাম না মা! উনি যে কি চোখেই টাকাটাকে দেখতেন! নিজেও ভোগ করে গেলেন না, আর তোদের ভাগ্যেও চাপিয়ে গেলেন দুঃখের বোঝা। টাকা খরচের ভয়ে তোকে বিয়ে দিলেন এক পাগলের সঙ্গে। ছোট মেয়ে তো বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিবার দুঃখেই আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পর্যন্ত তুলে দিল। লোকে বলে এখন নাকি সে থিয়েটারে যেয়ে নটী হয়েছে। অতবড় জমিদারিটা অভাগী কিনা বেচে দিয়ে গিয়ে এইসব করে বেড়াচ্ছে। ভগবান জানেন এখন সে কোথায় আছে।

নিরুপমা। তুমি চুপ কর মা। বেশী কথা বললে আবার তোমার হাঁফ্ ধরবে।

ললিতা। চুপ করব মা—একেবারেই চুপ করবার দিন এসে গেছে আমার। আমার দুঃখের কথাগুলো বলতে দে। মা-বাপ মরা অজয় ছেলেটা বাড়িতে এসে আশ্রয় নিল—একটি দিনের জন্যও এ বাড়িতে সে ভাল ব্যবহার পেল না। ওর সম্পত্তি তো কম ছিল না। কর্তা স্বর্গে গেছেন—কিন্তু উনিই তো সে সম্পত্তি জমিদারের খাজনা না দিয়ে নিলেম করে বেনামীতে কিনে নিলেন। ছোঁড়াটার চলে যাবার সময়কার সেই মুখখানা আমি আজও ভুলতে পারি নাই। ভগবান জানেন সে বেঁচে আছে কিনা! যদি কখনও দেখা পাই তাহলে তার সম্পত্তি তাকে দিয়ে আমি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। আর শুধু তার সম্পত্তিই বা কেন, আমাদের সব সম্পত্তিই তো আমি মরে গেলে তারই পাবার কথা।

নিরুপমা। ওসব ভেবে আর কি করবে মা? আজ আমি সুধাংশু ঠাকুরপোকে চিঠি লিখে দিয়েছি কলকাতায় একখানা বাড়ি ঠিক করতে। তার চিঠি পেলেই টাকা পাঠিয়ে দেব। ওখানে যেয়ে ভাল চিকিৎসা-হ'লে তুমি শীগ্গীরই সেরে উঠবে।

ললিতা। আমার এখন কি ইচ্ছা হয় জানিস মা?

নিরুপমা। কি মা?

ললিতা। মনে হয় মরবার আগে যদি অনু আর অজয়কে একটিবার দেখে যেতে পারতাম। মেয়ে আমাকে ভুলে গেছে

কিন্তু আমি কিছুতেই তো তা পারি না মা। আর সেই মা বাপ মরা ছেলেটা! আহা, না জানি কত কষ্টই না সে পাচ্ছে।

নিরুপমা। কলকাতা যাব তো ঠিকই করেছি মা। ওখানে গেলে হয়তো ওদের দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়ে যেতে পারে।

সাত আট দিন পরেই কলকাতা থেকে সুধাংশুর চিঠি আসে। সে লিখেছে যে শ্যামবাজারে ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউতে ফ্লাট ঠিক হয়ে গেছে। চিঠি পাওয়ামাত্র যেন বাড়ি ভাড়ার জন্য অগ্রিম পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চিঠি পাবার পরদিনই নিরুপমা মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দেয়। ইতি-মধ্যে নিরুপমা বাড়ির সব বিলি বন্দোবস্ত করে নগদ টাকা গয়নাপত্র সব ঠিকঠাক করে রেখে দেয়। শশিকান্ত ব্যাঙ্কে টাকা রাখা পছন্দ করত না। বাড়িতেই এক লোহার সিন্দুকে টাকা রেখে চোর ডাকাতের ভয়ে মাটির তলায় পুতে রেখেছিল। বাইরে আর একটা সিন্দুকে কাজকারবারের জন্য কিছু টাকা মাত্র রাখত। নগদ টাকা বেশী না রেখে সে কেবল ভূসম্পত্তি বাড়িয়ে গিয়েছিল। তবুও যা ছিল এক রাত্রে নিরুপমা কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সেই সিন্দুক থেকে বার কল্লে দেখল যে ওতে নগদ দশ হাজার টাকা আর বহু গয়নাপত্র আছে। গয়নাপত্র-গুলো সবই বন্ধকী মাল যেগুলো লোকে খালাস করতে পারে নাই।

বছর কয়েক আগে বাড়িতে একবার ডাকাত পড়েছিল। তখন শশিকান্ত বেঁচে ছিল। শশিকান্ত অম্লান বদনে ডাকাতদের হাতে বাইরের লোহার সিন্দুকের চাবিটা দিয়ে বলেছিল "আমাকে তোমরা মারধোর কর না বাবারা। আমার নগদ টাকাকড়ি কিছুই বিশেষ নাই। যা আছে সবই সম্পত্তিতে।" ডাকাতরা সিন্দুক খুলে মাত্র শ'দুই টাকা পেয়েছিল। সেই থেকে আর কোন ডাকাতি হয় নাই বাড়িতে কারণ ডাকাতের দল বোধ হয় বুঝে নিয়েছিল যে সত্যিই ওর যা কিছু সবই সম্পত্তিতে; নগদ টাকা কিছু নাই।

এবার তাই নিরুপমা টাকা আর গয়নাগুলো বার করে ওগুলো ভাল করে লুকিয়ে বেঁধে একটা বালিশের মধ্যে ভরতি করে রেখে দেয়। ভয়—যদি ইতিমধ্যে ডাকাত পড়ে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আবার সুধাংশুর চিঠি আসে। সুধাংশু লিখেছে যে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়ে গেছে—আপনারা এখন যে কোন দিন আসতে পারেন। আসবার আগে চিঠি দিতে লিখেছে কারণ তাহলে সে স্টেসনে উপস্থিত থাকতে পারবে।

এরপর একদিম গ্রামের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ির পুরানো চাকর দাশু আর রুগ্না মাকে নিয়ে নিরুপমা গরুর গাড়ীতে চেপে স্টেসনে এসে দাশুকে দিয়ে কলকাতার ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কিনে আনাল। ছোট্ট স্টেসনে ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট সচরাচর বিক্রি হয় না। ফার্ষ্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জার দেখে

স্টেসন মাষ্টার তাড়াতাড়ি ওয়েটিং রুম খুলে দিয়ে নিরুপমাকে আপ্যায়িত করে বলে—"কোন অসুবিধে হলেই আমাকে খবর দেবেন।"

ললিতা বুঝতে পারে যে সংসারে খাতির যত্ন যা কিছু সবের মাপকাটিই হচ্ছে মানুষের টাকা ব্যয় করবার ক্ষমতা। ভগবানের কৃপায় টাকা তাদের ছিল, তাই সে স্থির করেছে যে এবারে বড় মানুষের মতই থাকতে হবে।

শিয়ালদা থেকে সুধাংশু ওদের সঙ্গে করে নূতন বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে এসে আগেই বিছানা করে ললিতাকে শুইয়ে দেয়। সেদিনের মত বাজারের খাবার কিনেই কাটায় ওরা।

সুধাংশু যাবার সময় বলে যায় যে সে কাছেই থাকে, রোজই এসে খোঁজ খবর নিয়ে যাবে, তাছাড়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেও যা দরকার সে সবও করে দেবে।

পরদিন বিকালে সুধাংশু এসে দাশুকে সঙ্গে নিয়ে বউবাজার থেকে দুখানি খাট, একটা টেবিল, একখানা ছোট সেলফ্, কয়েকখানা চেয়ার, পর্দা, পাপোশ, রান্না ঘরের সাজ-সরঞ্জাম, এইসব কিনে নিয়ে এল। নিরুপমা বলল "ঠাকুরপো, টাকার জন্য তুমি চিন্তা ক'রো না, একমাসের মত সংসারের যা কিছু দরকার সব কিনে দাও, আর একজন রাঁধুনী বা ঠাকুর জোগার করে করে দিও যত শীগগীর পার। আমি রান্না বান্না নিয়ে থাকলে মা'র দেখাশুনা হবে না।"

সুধাংশু সবকিছু কিনে এনে দিল। দাশুকে বাজার চিনিয়ে দিল আর ঐ পথে নিজের হোস্টেলও দেখিয়ে নিয়ে এল যদি কখনও খবর দিবার দরকার হয় এই ভেবে।

সব কেনাকাটা হয়ে গেলে সুধাংশু একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ললিতার খাটের পাশে বসে বলল "বাড়িখানা ভালই পাওয়া গেছে কি বলেন? তাছাড়া পাশের ফ্লাটে যাঁরা আছেন ওরাও লোক খুব ভাল। ভদ্রলোকের নাম অজয় বাবু, চমৎকার লোক, সেদিন তো আমাকে ডেকে নিয়ে ওঁদের ওখানে চা খাইয়ে তবে ছাড়লেন।"

ললিতা। কি নাম বললে?

সুধাংশু। অজয় বাবু, অজয় কুমার দত্ত।

ললিতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—"আর কে আছে তার এখানে?

সুধাংশু। তাঁর মা আর ছোট এক বোন।

এই কথাশুনে ললিতা আর আগ্রহ প্রকাশ করল না ওদের খবর জানতে।

* * *

নিরুপমার সঙ্গে ইতিমধ্যেই শীলার বেশ ভাব হয়ে গেছে। শীলা দু'একবার ওদের ফ্লাটেও গেছে। অজয় তখন কিছু দিনের জন্য দার্জিলিং গিয়েছিল, কারণ দার্জিলিংয়ে ওদের কোম্পানির পরবর্তী ছবির কতকগুলো আউটডোর্ সুটিং হবে।

এদিকে কলকাতার জলবাতাসের গুণেই হোক আর কিছু ক্যালসিয়াম ইনজেকশনের গুণেই হোক ললিতার বেশ একটু উন্নতি দেখা গেল।

মা একটু ভাল আছে দেখে নিরুপমা একদিন শীলার সঙ্গে সিনেমায় গেল। যে ছবিখানি সেদিন দেখানো হচ্ছিল সেটা রুপাঞ্জলি পিকচার্সেরই একখানা নাম করা ছবি। ছবিতে অনুপমাকে দেখে নিরুপমা আশ্চর্য্য হয়ে যায়, শীলাকে জিজ্ঞাসা করে—এমেয়েটির নাম কি জানো ভাই ?

শীলা বলে "নিশ্চয়ই ! ইনিই তো অনুপমা দেবী, দাদাতো ওঁর ওখানেই কাজ করেন। খুব ভাল পার্ট করেন না দিদি ?"

নিরুপমা বলে "ওকে দেখতে ঠিক আমার ছোট বোনের মত, নিশ্চয়ই ও আমাদের অনু। তুমি একবার ওর সঙ্গে আমায় দেখা করিয়ে দিতে পার বোন ?"

শীলা। নিশ্চয়ই পারি, কিন্তু ওঁরা তো এখন কলকাতায় নেই, দাদা এলেই একদিন ওঁকে আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবো, সেই দিনই দেখা হতে পারে আপনার সঙ্গে।

পরদিন শীলা বিশেষ লক্ষ্য করে দেখল যে সত্যিই অনুপমা দেবীর মুখের সঙ্গে নিরুপমার মুখের যেন অনেকটা মিল আছে। এরপর কথায় কথায় শীলা আর একদিন জানতে পারে অজয়ের কথা। সে কিভাবে বাড়ি থেকে চলে যায় সব খরব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে শীলা। শীলার সন্দেহ হয় যে তার অজয়দাই এদের সেই হারিয়ে যাওয়া অজয়।

একটা বিষয় তার মনে কিন্তু খুবই খট্‌কা লাগে। অনুপমা যদি সেই অনুপমা হ'ত তাহলে নিজের পিশতুত ভাই অজয়কে সে নিশ্চয়ই চিনতে পারতো। তখন সে আবার ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে মনে মনে হিসাব করে দেখে যে অজয় যখন বাড়ি থেকে চলে যায় তখন তার বয়স বার বৎসর। অনুপমা তখন আরও ছোট ছিল। এ অবস্থায় এতদিন পরে দেখাদেখি হওয়ায় না চেনাটাই সম্ভব।

শীলা এরপর একদিন ওদের ফ্লাটে গিয়ে ললিতার সঙ্গে দেখা করে বললো "আমি বোধ হয় আপনার মেয়ে আর সেই হারিয়ে যাওয়া অজয়কে খুজে বার করে দিতে পারব।"

ললিতা। পারবে মা? পারবে তুমি ওদের খুঁজে বার করতে? আমি যে তাহলে একটু শান্তিতে মরতে পারি মা।

ষোল

কয়েকদিন পরেই অজয় ফিরে এল। তার এখন কাজের ভয়ানক চাপ। এক মাসের মধ্যেই এই ছবিখানিকে প্রিন্টিং, ডেভেলপিং, এডিটিং সবকিছু শেষ করে ফেলতে হবে। তারপর সেন্সার বোর্ডে পাশ করিয়ে রিলীজ্ করাতে হবে। পাবলিসিটি অফিসার ইতিমধ্যেই রূপাঞ্জলী পিকচার্সের পরবর্তী আকর্ষণ "মাটির মায়া" ছবির আগমনী সংবাদ জানিয়ে সহরময় পোষ্টার দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে, রেস্টুরেন্টগুলিতে হুইস্পারিং-প্রোপাগাণ্ডা-এজেন্টরা আসর জমিয়ে তুলেছে। অজয়ের আর নিঃশ্বাস ফেলবারও অবসর নাই। বলতে ভুলে গেছি, অজয়ের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে অনুপমা তার মাইনে বাড়িয়ে মাসে আড়াই'শ টাকা করে দিয়েছে।

সেদিন অফিস যাবার সময় শীলা বলল, "দাদা! অনুপমা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবে বলেছিলে—দিলে না তো?"

অজয়। বেশত, চল না আজই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তাঁর সঙ্গে।

শীলা। সত্যি বলছ?

অজয়। সত্যি নয়তো কি! এখন তো আর ওঁর শূটিং নেই তাছাড়া অফিসের কাজকর্ম তো আমরাই দেখছি।

* * *

অজয় শীলাকে নিয়ে অনুপমার কামরায় যেতেই অনুপমা জিজ্ঞাসা করল "ইনি কে অজয় বাবু?"

অজয়। এর কথা আপনাকে আমি আগেও বলেছি, এ-ই আমার বোন, শীলা। আপনার সঙ্গে দেখা করতে বিশেষ উদ্‌গ্রীব আর তার জন্য আমাকে সবিশেষ তাগিদ।

শীলা নমস্কার করতেই অনুপমা চেয়ার থেকে উঠে এসে তার হাত ধরে বলল, "তুমি শীলা! এস আমরা উপরের ঘরে যাই, অফিসে বসে কি তোমার সঙ্গে কথা বলা চলে!"

সঙ্গে করে শীলাকে নিজের ঘরে এনে বসিয়ে অনুপমা জিজ্ঞাসা করল "তোমার মা কেমন আছেন?"

শীলা জানায় যে তার মা ভালই আছেন।

অনুপমা শীলাকে নিজের বোনের মত আদর ক'রে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল। অনুপমার সঙ্গে আলাপ ক'রে শীলাও খুবই খুশী হ'ল তাই যাবার-সময় সে অনুরোধ করল "আপনাকে একবার আমাদের বাড়িতে যেতে হবে কিন্তু?"

অনুপমা। বেশত, কবে যাব বল?

শীলা। কালই চলুন না, অফিসের পরে—দাদার সঙ্গে!

অনুপমা একটু ভেবে বলল "কালই! আচ্ছা তাই হবে।"

শীলা। কাল আপনাকে আমি একটা চমৎকার গল্পের প্লট বলব। আমি মনে মনে ভেবে রেখেছি প্লটটা যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে লিখে ফেলতে চেষ্টা করব।

অনুপমা। তুমি গল্প লেখ নাকি?

শীলা। কলেজে পড়বার সময় কলেজ ম্যাগাজিনে দু'একটা লিখতুম কিন্তু এখন আর লিখি না, যাক্‌গে—কাল আসছেন তো?

অনুপমা বলল—না গেলে কি বোনটি আমাকে ছাড়বে নাকি?

শীলা বলল "আমাকে চিনে ফেলেছেন দেখছি?"

বাড়িতে এসে শীলা নিরুপমাকে বলল "নিরুদি, কাল অনুপমা দেবী আমাদের বাড়িতে আসবেন। আপনি তখন থাকবেন আমাদের বাড়িতে—মায়ের ঘরে লুকিয়ে থাকতে হবে কিন্তু!"

নিরুপমা হেসে বলে "কেনরে পাগলী মেয়ে, লুকিয়ে থাকতে যাব কোন দুঃখে?"

শীলা বলে—"বেশীক্ষণ আপনাকে লুকিয়ে থাকতে হ'বে না। আমার প্ল্যান যদি ঠিক মত লাগে, দেখবেন সেও হবে এক চাঞ্চল্যকর অভিনয়।"

যথাসময় অজয়ের সঙ্গে অনুপমা এসে গেল। শীলা আগে থাকতেই খাবার তৈরি করে চায়ের ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিল।

সে অনুপমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসে বসাল। শীলার মা এসে অনুপমার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করতেই শীলা চট্ করে পাশের বাড়িতে গিয়ে নিরুপমাকে ডেকে নিয়ে এসে বলল আপনি মায়ের ঘরে চুপটি করে বসে থাকুন। আমি না ডাকলে কিন্তু ও ঘরে যাবেন না। নিরুপমাকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে এসে চায়ের সরঞ্জামগুলো টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখতে রাখতে শীলা বলল "মা ইনি কিন্তু আমার দিদি! কাল সম্বন্ধ পাতানো হয়ে গেছে।"

মমতা বলল "পাগলী মেয়ে! এত দুঃখেও মায়ের আমার মুখে হাসি লেগেই আছে।"

শীলা পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে দিতে বলল "নিন, আর দেরী নয়! চা খেতে খেতে আমি সেই গল্পের প্লটটি বলব।"

অনুপমা। ও তাইতো! বেশ তুমি সুরু কর।

শীলা। বলছি, "আজ থেকে বছর দশেক আগের কথা। লক্ষ্মীপুর নামে বাংলাদেশের এক গ্রামে শ্যামাকান্ত বোস নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। তার এক ছেলে নাম শশিকান্ত আর এক মেয়ে তার নাম শৈলবালা। শশিকান্তর দুই মেয়ে, একজনের নাম নিরুপমা আর একজনের নাম অনুপমা আর শৈলবালার একটি মাত্র ছেলে তার নাম অজয়। খুব ছেলে-বেলায় অজয়ের বাপ মা মারা যেতে সে মামার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ত। একদিন একটা সামান্য কারণে শশিকান্ত অজয়কে মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেয়।

অজয় জিজ্ঞাসা করে—এ গল্পের প্লট তুমি কোথায় পেলে শীলা ?

অনুপমা বলে "তারপর কি হল ?"

শীলা। তারপর সেই অনুপমার বিয়ে হয় এক বুড়ো জমিদারের সঙ্গে। তার বড় বোন নিরুপমার বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল এক পাগল ছেলের সঙ্গে। কিছুদিন পরে সেই বুড়ো জমিদার মারা যায়। অনুপমা তখন সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে কলকাতা চলে আসে। অবশ্য সম্পত্তি বিক্রি করতে হ'লে তার বিক্রি করবার আইনসংগত অধিকার থাকা চাই, সে একটা কিছু দানপত্রটত্র করিয়ে দিলেই চলবে।

অনুপমা—তারপর !

শীলা। এদিকে সেই অজয়ও কোথাও ঠাঁই না পেয়ে কলকাতায় এসে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় পায়। অজয় ক্রমে লেখাপড়া শিখে বি এ পাশ করে। সেই ভদ্রলোক অজয়কে নিজের ছেলের মতই মনে করত। তারপর ভাগ্য বিপর্যয়ে সেই ভদ্রলোককে কলকাতার বাইরে চলে যেতে হয় কয়েক বৎসরের জন্য। দেনার দায়ে তার সমস্ত সম্পত্তি এমন কি বসত বাড়িখানা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়।

অজয়। এযে তুমি আমার কথা বলতে আরম্ভ করেছ দেখছি !

শীলা। তুমি বাধা দিলে আমার 'ফ্লো' নষ্ট হয়ে যাবে দাদা।

অনুপমা। আচ্ছা তুমি বল তারপর কি হল !

শীলা। তারপর শশিকান্ত মারা যায়। তার স্ত্রী অর্থাৎ অনুপমার মা যক্ষ্মারোগে মরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতা চলে আসে বড় মেয়ে নিরুপমাকে নিয়ে। তার অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে······

অনুপমার চোখ দু'টি এতক্ষণ ছলছল করছিল। এই কথা শুনে অশ্রু আর বাধা মানলো না।

শীলা। একি দিদি! আপনি কাঁদছেন?

অনুপমা চোখ মুছে বলল "না তুমি বল তারপর কি হল?"

শীলার বুঝতে বাকি রইল না যে এই অনুপমাই সেই অনুপমা। সে তখন খানিকটা কল্পনায় গল্পের ফাঁক পূরণ করে নিয়ে বলল—"তারপর সেই অনুপমা কলকাতা এসে এক ফিল্ম কোম্পানি খুলে নিজেও অভিনয় করতে আরম্ভ করল। এদিকে ভাগ্য বিপর্যয়ে ঐ অনুপমার অফিসেই সেই অজয় পায় চাকরি কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ওরা কেউ কাউকে চিনতে পারল না।"

অজয় তখন অনুপমার দিকে তাকাচ্ছে আর অনুপমা অজয়ের দিকে। অজয় যেন খুঁজে পায় তার সেই ছোট বোনটিকে অনুপমার মধ্যে। অনুপমা বলে "এ গল্প তুমি কোথায় পেলে শীলা—সে কথা বলতে হবে আমাকে?"

শীলা বলে "এ গল্প পেয়েছি আমি পাশের ফ্ল্যাটের নিরুপমাদির কাছে, ডাকব তাঁকে? এই বলে শীলা উঠে পাশের ঘরের দরজা খুলে ডাকে, "নিরুদি!"

নিরুপমাকে দেখেই অনুপমা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল "দিদি! তুমি? মা কোথায়?"

নিরুপমা। অনু তোকে যে আবার খুঁজে পাব একথা কখনও ভাবি নাই। মা'তো সুধু তোকে একটিবার দেখবার জন্যই এখনও বেঁচে আছেন। চল মা'র কাছে যাই।

শীলা। একি নিরুদি! আপনার সেই ভাইএর খবর তো নিতে চাইলেন না! (এই বলে অজয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলে)

"অজয়দা ইনি তোমার সেই মামাতো বোন অনুপমা, আর ইনি নিরুপমা।

অনুপমা। দাদা, তুমি, আমায় ক্ষমা ক'রো। কত অপরাধ করেছি তোমার কাছে তোমার সঙ্গে কর্মচারীর মত ব্যবহার করে।

অজয়। অনু বোনটি আমার! তোমাকে যে এইভাবে পাব একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—কিন্তু আর দেরী নয়, চল আগে মামীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

শীলা বলল "সে হবে না! আগে আমি যাব।"

শীলা একরকম ছুটতে ছুটতেই ললিতার কাছে গিয়ে বলল, "আপনার ছোট মেয়ে আর সেই হারাণো অজয় আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে মামীমা।"

ললিতা। অ্যাঁ! কি বললে তুমি? কারা আসছে!

শীলা। আপনার ছোট মেয়ে অনুপমা আর সেই হারিয়ে যাওয়া ভাগ্নে অজয়।

এই বলেই সে ফিরে এসে অনুপমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল পাশের ফ্লাটে। নিরুপমা আর অজয়ও চলল ওদের পেছনে।

মাকে দেখে অনুপমা—"মা মাগো, তুমি কি হয়ে গেছ মা" বলে একেবারে তার বুকের মধ্যে মাথা রাখল। অজয় বলল "মামীমা! আমি ফিরে এসেছি!"

ললিতা। আমার কাছে আয় বাবা! আমি যে এতদিন যক্ষের মত তোর সম্পত্তি আগলে বসে আছি। এইবার তোর বিষয় সম্পত্তি তুই বুঝে নিয়ে আমাকে ছুটি দে।

অজয় কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ললিতা শীলাকে ডাকল, "একবারটি আমার কাছে এস তো মা।"

শীলা কাছে এলে তার একখানা হাত অজয়ের হাতে দিয়ে বলল "একটু আগে তুমি আমাকে মামীমা বলে ডেকেছিলে! তখন সত্যি মামিমা ছিলাম না, তাই আমি যাতে তোমার সত্যিকারের মামীমা হতে পারি তারই ব্যবস্থা করে দিলাম।"